ভগিনী নিবেদিতা। মণি বাগচি
Odeno 4.8
SL no 51
1950 In the Press

ভগিনী নিবেদিতা

৪৭৪

মণি বাগচি

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের নতুন ঠিকানা
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

ভগিনী নিবেদিতা =২

ACC NO - 15100

৪.৮

৪৭৪

স্মরণীয়-বরণীয়-১০

ভগিনী নিবেদিতা

মনি বাগচি

ঈশান গ্রন্থালয়
৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।

দুঃখলেশহীন একটি পবিত্র হোমানলের প্রদীপ্ত শিখা।

ইংল্যান্ডের উদ্যান থেকে যে শ্রেষ্ঠ ফুলটি চয়ন করে নিয়ে এসে ভারতমাতার চরণে নিবেদন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তারই নাম নিবেদিতা। বিদুষী আইরিশ কুমারী এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল লণ্ডনেই স্বামীজিকে তাঁর গুরুরূপে গ্রহণ করেন এবং এদেশের কাজ করবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে, এই দেশে চলে আসেন। তখনি গুরু তার নাম রাখেন 'ভগিনী নিবেদিতা'। এই নামের মধ্যেই ঘটেছিল এক নারীজীবনের আশ্চর্য রূপান্তর। জন্মান্তরও বলা চলে।

নিবেদিতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের উপসংহার, যেমন বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর ইষ্টদেব রামকৃষ্ণের জীবনের উপসংহার। আইরিশ দুহিতা মিস নোবল যেদিন ভারতদুহিতা নিবেদিতা রূপে নবজন্ম লাভ করেন, সেদিন থেকে তিনি নিজেকে ভারতের সেবিকা বলেই মনে করতেন। তাঁর মতো প্রাণ ঢেলে এই দেশকে, এই দেশের জনসাধারণকে ভালবাসতে খুব কম লোকই পেরেছেন। এই মহীয়সী নারীর জীবন আমাদের জীবনকে মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ করবে।

[illegible]

নিবেদিতা

তুমি বুঝি ভারতের শাপভ্রষ্ট তাপসী তনয়া
তাই এত তার তরে এত ভক্তি, এত স্নেহ-মায়া?
তাই বুঝি সে-বন্ধন ক্ষয় হতে যায় জন্মান্তরে
ফিরিয়া আসিতে যারে দেশান্তরে পর্বতে-সাগরে।
সযতনে সঙ্গোপনে অন্তরের পূত অর্ঘ্য নিয়া
সুদূর পশ্চিম হতে ভারতেরে করাঞ্জলি দিয়া
এলে তুমি, ভারতের পদমূলে হলে সমর্পিতা
ক্ষীণ তনু, শুভ্র শান্ত, দেবী তুমি, তুমি নিবেদিতা।
গুরুর ভারত-স্বপ্ন জাগ্রত ছিল আঁখির
জানিয়া দেখিয়াছিলে কী নয়নে কী মূরতি তাঁর?
তুমি কি ভাবিয়াছিলে ভারতের প্রতি দিকে দিকে
দেবতারা খেলা করে? শিব ভালোবাসিত গৌরীকে?
বুদ্ধ আসে ধ্যানে বসি ফল্গুতীরে বোধি তরুতলে?
ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরে বজ্র হানে দধীচির বলে?
তুমি কি ভাবিয়াছিলে ভারতের অরণ্যের মাঝে
ঋষিদের বেদগান সন্ধ্যারাগে মধুসুরে বাজে?
তুমি কি দেখিয়াছিলে ভারতের অণু-পরমাণু
গিরি গুহা শিখর প্রান্তর নদনদী বন ভানু
সবি দেবময়? ভারতের কৃশ নগ্ন অর্ধমৃত
জীবচয়, — তারাও দেবতা তব হলো নির্বাচিত।

॥ এক ॥

সাল ১৮৯৫। নভেম্বর মাস।

রবিবারের সুন্দর বিকেলবেলা।

লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ডে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের বৈঠকখানা।

সেখানে এসেছেন এক হিন্দু যোগী তরুণ। তাঁকে দেখতে ও তাঁর মুখের কথা শুনতে পনেরো-ষোলজন অভ্যাগত উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা সবাই বসে আছেন অর্ধ-বৃত্তাকারে। সন্ন্যাসী তাঁদের দিকে মুখ করে বসে আছেন। পেছনে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে। ঘরোয়া বৈঠক। এক তরুণী বিদুষী মহিলা ঘরের মধ্যে ঢুকে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন।

সন্ন্যাসীর পরনে গৈরিক পরিচ্ছদ, চেহারা উজ্জ্বল ও বীরত্ব-ব্যঞ্জক। আয়ত দুটি চোখ, প্রশান্ত মুখমণ্ডল কপালো। সব মিলিয়ে যেন একটি প্রখর ব্যক্তিত্বের ছবি। এমন ছবি লন্ডনে এর আগে, দেখা যায় নি। ক্রমে বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলো। নানা প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসী প্রায়ই সংস্কৃত শ্লোক সুর করে আবৃত্তি করছিলেন। উদাত্তকণ্ঠের সেই আবৃত্তি সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। মহিলাটির কাছে সবই নতুন, তাই তিনি খুব বিস্ময়-বোধ করছিলেন। 'সকল ধর্মই একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সমানভাবে সত্যি।' সন্ন্যাসীর এই কথাটি মহিলাটির অন্তরে গিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তাঁর মন বলল, এই যে তাঁর প্রতীক্ষিত জীবন-দেবতা।

এই হিন্দু যোগী স্বামী বিবেকানন্দ।

এই মহিলা মিস এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল।

ইনিই পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা রূপে ভারতবাসীর হৃদয়ে লাভ করেছিলেন দুর্লভ শ্রদ্ধার আসন।

এঁরই বিচিত্র জীবনকথা আজ তোমাদের শোনাব।

Space

উত্তর আয়ারল্যান্ডের টাইরন অঞ্চলের ডানগ্যানন শহর।

ছোট্ট শহর। এখানকার এক গির্জার পুরোহিত ছিলেন রেভারেন্ড জন নোবল। এঁর পূর্বপুরুষগণ অনেককাল আগে এখানে এসে স্কটল্যান্ড থেকে বসবাস শুরু করেন। জনের ছেলে স্যামুয়েল রিচমন্ডও বড় হয়ে পুরোহিতের বৃত্তি নিয়েছিলেন। মেরি হ্যামিলটনের ইজাবেলা সঙ্গে স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবলের বিয়ে হয়। ইসাবেল ছিলেন পরমাসুন্দরী। তাঁর বাবা ছিলেন রাজনীতির একজন বিশিষ্ট নেতা। আইরিশ হোমরুল (স্বায়ত্ত-শাসন) আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। বিয়ের পর স্যামুয়েল স্যামুয়েল রিচমন্ড ডানগ্যানন শহরে তাঁর কর্মক্ষেত্র ঠিক করেন। বাবার মতো স্যামুয়েলও ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট শ্রেণীর পুরোহিত। এই ছোট্ট শহরেই ১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর, শরতের এক সোনাঝরা সকালে মার্গারেটের জন্ম হয়।

মার্গারেট ছিলেন স্যামুয়েল দম্পতির প্রথম সন্তান।

মায়ের রূপলাবণ্য নিয়েই মেয়ের জন্ম।

মার্গারেট যখন মাতৃগর্ভে, তখন ইসাবেল সব সময় ভগবানের কাছে তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে এই প্রার্থনা করতেন: 'প্রভু, আমার সন্তান যদি নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে তোমার কাজেই আমি ওকে সঁপে দেব।' ঈশ্বরে

পৃথিবীর আলো দেখবার আগেই মার্গারেট দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিলেন। মায়ের মনের কথা ভগবান কি শুনেছিলেন? হয়ত শুনেছিলেন; নইলে মাতৃ-হৃদয়ের এই পবিত্র সংকল্প তাঁর প্রথম সন্তানের জীবনে কেমন করে অমনভাবে সার্থক হয়েছিল! মার্গারেটের জন্মলগ্নে বিধাতাপুরুষ তার ললাটে কি লিখেছিলেন, সে কেউ জানে না। কিন্তু ইজাবেলের চোখ সেই অদৃশ্য ললাট-লিপি নিশ্চয়ই পাঠ করে থাকবে।

ছেলেবেলায় মার্গারেট তাঁর ঠাকুরমায়ের কাছেই মানুষ হয়েছিলেন। ঠাকুরমায়ের নামে নাম মিলিয়েই নাতনির নাম রাখা হয়েছিল মার্গারেট এলিজাবেথ। মার্গারেটের বাবা যখন ডানগ্যানন শহর ত্যাগ করে ইংলণ্ডে চলে যান তখন তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে মায়ের কাছে রেখে ম্যানচেস্টারে চলে যান। তখন থেকেই ঠাকুরমায়ের কাছে মার্গারেট নিবিড় লালিত-পালিত হন। ঠাকুরমায়ের বাগান ঘেরা বাড়িটিতে আনন্দের মধ্যেই মার্গারেটের শৈশবের দিনগুলো কেটেছিল। ঠাকুরমাকে ঠিক দেবীর মতো ভালবাসতেন মার্গারেট; মার্গারেটও ছিলেন তাঁর চোখের মণি। ঠাকুরমাকে তিনি এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল হতে দিতেন না; সব সময় তাঁর পায়ে-পায়ে ঘুরতেন।

বাইবেল ছিল ঠাকুরমায়ের নিত্যপাঠ্য। নাতনিকে কাছে বসিয়ে তিনি সকাল ও সন্ধ্যা দু'বেলা বাইবেল পড়তেন। এই বাইবেল থেকেই মার্গারেটের বর্ণপরিচয় হয়েছিল ঠাকুরমায়ের কাছেই। বৃদ্ধা বাইবেল থেকে

নীচু গলায় রোজ গাইতেন দুবেলা; ওই স্তব স্তবে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল মার্গারেটের। ঠাকুরমায়ের সঙ্গে সুললিত কন্ঠে সেই ভজনগুলি আবৃত্তি করতে একটুকু ক্লান্তি ছিল না মার্গারেটের। জীবনের প্রথম চার বছর এইভাবে অনুরাগী হয়েছিলেন তিনি স্নেহময়ী ঠাকুরমায়ের কাছে। এই বয়সেই বাইবেলের উপদেশগুলো বালিকার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল — এমনি প্রখর ছিল তাঁর স্মরণশক্তি।

কিছুদিন ম্যানচেস্টারে বাস করে, রেভারেন্ড স্যামুয়েল যখন ওল্ডহ্যামে তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন, তখন মার্গারেট আবার বাবা-মার কাছে চলে আসেন। তখন তাঁর একটি বোনও হয়েছে; নাম- মে। ওল্ডহ্যামে আসবার পর একটু বড় হলেই মার্গারেট ও মে-কে প্রথমবার একটি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। মার্গারেটের যখন সাত বছর বয়স, তখন দেশ থেকে একদিন সংবাদ এলো যে ঠাকুরমায়ের মৃত্যু হয়েছে। খবর শুনে বালিকা এক ফোঁটা চোখের জল ফেললেন না, কেবল বুকের ভেতরটা যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে রইলো।

চার বছর পরে স্যামুয়েল ওল্ডহ্যাম ছেড়ে এলেন ডেভনের একটি পল্লীগ্রামে। নাম- গ্রেট টরিংটন। গ্রামের শান্ত পরিবেশের মধ্যে এসে মার্গারেটের মনে হলো তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। মার্গারেট ছিলেন তাঁর বাবার খুব আদরের মেয়ে। বাইরে বেড়ানো বা খেলাধুলো ছেড়ে, মার্গারেট সবসময় বাবার সঙ্গে থাকতে পছন্দ করতেন। স্যামুয়েল যখন গির্জায় উপদেশ দিতে যেতেন, মার্গারেট

যেতেন সঙ্গে সঙ্গে। বাবার উপাসনা করার ধরন-ধারন দেখে, তাঁর মুখে ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা শুনে, কন্যার মন যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। বাইবেলের বিচিত্র কাহিনী-গুলি বালিকাকে যেন বাস্তব জগতের বাইরে অন্য এক লোকের সন্ধান দিত। প্রকৃতপক্ষে সেই দ্বাদশ বছর বয়স থেকেই ধর্মজীবনের প্রতি মার্গারেটের ধীরে ধীরে অনুরাগ জন্মায়।

একদিন। স্যামুয়েলের এক ধর্মযাজক বন্ধু এলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি অনেকদিন ভারতবর্ষে ছিলেন। বালিকা মার্গারেটের ফুলের মতো কোমল পবিত্র মুখ তাঁকে আকৃষ্ট করলো। আশীর্বাদ করে তিনি বললেন, ভারতবর্ষ একদিন তোমাকে ডাক দেবে। বাবার বন্ধুটি হয়ত ভেবেছিলেন, বড় হয়ে মিশনারি প্রচারিকারূপে মার্গারেট ভারতবর্ষে যাবেন। ভারতবর্ষ সত্যি মার্গারেটকে ডাক দিয়েছিল। কিন্তু ধর্মপ্রচারিকারূপে নয়, সেবিকা হয়ে এসেছিলেন তিনি ভারতবর্ষে। বাবার বন্ধুর মুখে যখন তিনি ভারতবর্ষের নাম শোনেন, তখন তিনি কিছু জানতেন না, ভারতবর্ষ কোথায়। তবে সে বালিকার মনে জেগেছিল বিস্ময়।

১৮৭৭। বালিকার জীবনে এলো বিপর্যয়। টরেন্টন পল্লীতেই মারা গেলেন স্যামুয়েল। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে দুটি মেয়ে ও নাবালক এক ছেলেকে রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন স্যামুয়েল। মারা যাওয়ার আগে তিনি পত্নী মেরি নোবলকে বলে গেলেন, ভবিষ্যতে মার্গারেটের জীবনে এক বৃহত্তর আহ্বান আসতে পারে, সেদিন যেন তিনি মেয়েকে সাহায্য করেন। বাবার অকালমৃত্যু মার্গারেটের

হৃদয়ে খুব আঘাত দিয়েছিল। কৈশোরের আনন্দময় জীবনে দেখা দিল বিষাদের ছায়া। পিতা ছিলেন আদর্শের পূজারী। ধর্মযাজকবৃত্তি নিয়ে কোনদিন তিনি আর পাঁচজন ধর্মযাজকের মতো টাকা রোজগারের দিকে তেমন মন দেননি। তার ফলে দারিদ্র্যের মধ্যেই কেবল পরিবারের দিন কাটত।

স্বামীর মৃত্যুর পর মেরি দুটি মেয়ে ও শিশুপুত্র রিচমণ্ডকে নিয়ে আয়ারল্যাণ্ডে ফিরে এলেন তাঁর বাবার কাছে। মেরির বাবা হ্যামিলটন ছিলেন রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট নেতা। দাদামশাইয়ের সংস্পর্শে মার্গারেটের কিশোর চিত্তে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে দেশাত্মবোধ। আইরিশ জাতির স্বাধীনতা স্পৃহা অলক্ষ্যে কিশোরীর হৃদয়ে দৃঢ় হতে লাগল। যথাসময়ে মার্গারেট ও তাঁর বোন হ্যালিফ্যাক্সের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে এলেন। স্কুলটি ছিল চার্চের অধীনে। এই স্কুলের বেশির ভাগ ছাত্রীই তাঁদের মতো ধর্মযাজকের মেয়ে। স্কুলের ছাত্রী-নিবাসেই মার্গারেট ও মে-র থাকবার ব্যবস্থা হলো। এ এক নতুন জীবন। বাড়ি থেকে বোর্ডিং-এর পরিবেশটাই আলাদা। এখানে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সমস্ত সময় ঘড়ির ছাত্রীদের জীবন কাঁটা ধরে চলত। লেখাপড়া, খেলাধুলো, উপাসনা— প্রত্যেকটারই সময় নির্দিষ্ট।

মিস ল্যারেট প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। যেমন তাঁর কঠিন শাসন, তেমনি সতর্ক দৃষ্টি ছাত্রীদের ওপর। নীতিশিক্ষার ওপর ছিল তাঁর বেশি অনুরাগ। সকল ছাত্রীদেরই তিনি সযত্নে শিক্ষা দিলেন দুটো জিনিসে — আত্মত্যাগ আর সংযম। জীবনের শুরু থেকেই এইভাবে গড়ে উঠেছিল মার্গারেটের জীবন। ছাত্রীজীবনে মিস

ল্যারেটের প্রভাবটা এই মার্গারেটের মনে খুবই পড়েছিল। মিস ল্যারেটও তেমনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন মার্গারেটের প্রতি। মার্গারেট ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী। মেধা যেমন তীক্ষ্ণ, অধ্যয়নে তেমনি অনুরাগ। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য বই পড়াতেও আগ্রহ ছিল প্রচুর। সাহিত্য ছাড়া পদার্থ ও উদ্ভিদবিদ্যার প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। উত্তরকালে এই দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি তাঁর গবেষণার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পেরেছিলেন। যে-কাহিনী আমরা যথাসময়ে বলব। এইসব গুণেই তিনি প্রবীণা শিক্ষয়িত্রীর খুব প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন।

স্কুলে মার্গারেট এক আদর্শ ছাত্রীর গৌরব অর্জন করেছিলেন। কোন বিষয়ে ফাঁকি দেওয়া, বা ভাসাভাসা করে জানা তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে ছিল। সব বিষয়ই ভাল করে জানতে হবে, এই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। নিজের প্রখর ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি স্কুলে লাভ করেছিলেন সহপাঠিনীদের নেতৃত্ব। আর সব মেয়েদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য দেখা যেত। বাইরে থেকে হঠাৎ দেখলে তাঁকে গর্বিত, জেদী, অসহিষ্ণু ও দোর্দণ্ড বলে মনে হলেও বুদ্ধির প্রাখর্যে, চিন্তাশীলতায় ও অন্যের প্রতি সহৃদয়তায় তিনি সাধারণ মেয়েদের অনেক ওপরে ছিলেন। তেরো বছরের মেয়ে মার্গারেটের চিন্তাশক্তি দেখে তাঁর সহপাঠিনীরা বিস্মিত হতো। মেয়ের এই কৃতিত্বে, বলা বাহুল্য, মায়ের বুক গর্বে ভরে উঠত।

যথাসময়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মার্গারেট। এইবার আরম্ভ হয় তাঁর কর্মজীবন। আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন, তিনি

হবেন শিক্ষয়িত্রী। হয়ত আরো পড়াশুনা করতে পারতেন। কিন্তু তার উপায় ছিল না। বাবা নেই, মা, বোন আর না-বালক ভাই — এদের দায়িত্ব যে এখন তাঁর ওপর। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সেই বয়সে তিনি যে আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভাবলে পরে বিস্মিত হতে হয়।

১৮৮৪। শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়ে কেসউইকে চলে গেলেন মার্গারেট। তিন বছর পরে রাগবির এক অনাথ আশ্রমে কাজ নিলেন। উদ্দেশ্য, সেখানে দারিদ্র্য বরণ করে তিনি দেখবেন, তাঁর আত্মত্যাগ ও বৈরাগ্যের জোর কতখানি। এক বছর অনাথ আশ্রমে কাটিয়ে, মার্গারেট রেক্সহ্যামের সেকেন্ডারী স্কুলে কাজ নিলেন। এখানে কিছুকাল কাজ করার পর ১৮৮৯ সালে তিনি চেস্টারের এক বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিলেন। ছোট বোন মে তখন লিভারপুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছেন। দুইবোনের উপার্জনে কোনরকমে সংসার চলে যাবে ভেবে মার্গারেট পরিবারের দায়িত্ব [illegible] গ্রহণ করলেন। তাঁদের মা এতদিন আয়ারল্যান্ডেই ছিলেন। এবার তিনি চলে এলেন লিভারপুলে। এখানেই মার্গারেট তার ভাই রিচমন্ড নোবলের কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করলেন।

—

॥ দুই ॥

মাস্টারী করেই জীবন কাটাবেন, এই ছিল মার্গারেটের সংকল্প।

কিন্তু তা হলো না। তখন থেকেই শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর মনে জেগেছে কৌতূহল। তখন পেস্তালৎসি ও ফ্রয়েবেল এই দুই মনীষী শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। শিক্ষাবিস্তারে প্রয়াসীদের নেতা এঁরাই। শিশুর মনের জগৎকে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেন এঁরাই। তাঁরা বললেন, শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্থান সকলের আগে। শিশুর মনস্তত্ত্বকে অবলম্বন করে এই যে শিক্ষাপদ্ধতি, মার্গারেট তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তাঁর বয়স তখন অল্প; শিক্ষার কাজেও তিনি নতুন নেমেছেন। আন্তরিকতা আর উৎসাহ প্রচুর।

মার্গারেটের সামনে যেন খুলল একটা নতুন রাজ্য। নবশিক্ষার এই দুই পুরোধা তাঁকে যেন পথ দেখিয়ে দিলেন। লিভারপুলে গিয়ে ফ্রয়েবেলের শিষ্যা মিসেস ডি-লীউ-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। ডি-লীউ জাতিতে ডাচ ছিলেন। এঁর কাছেই মার্গারেট এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে প্রথম পাঠ গ্রহণ করলেন। এখানকার [illegible] ক্লাবের তিনি সদস্য হলেন। ক্লাবে তিনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন ও পাঠ করতেন নিজের লেখা প্রবন্ধ। ক্রমশ মার্গারেটের মনের দিগন্ত ছেয়ে ফুটে উঠতে লাগল রাশি রাশি চিন্তার ইন্দ্রধনু। তিনি পরিণত হলেন এক বিদুষী নারীতে।

১৮৯০। লন্ডনের উইম্বলডনে মার্গারেট একটা শিক্ষার স্কুলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিলেন। মিসেস ডি-লীউ ছিলেন এই স্কুলের পরিচালিকা। এখন থেকে নতুন আশা আর বিশ্বাসে ফলে ফুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভরে তোলাই হলো তাঁর জীবন-ব্রত। নিজের সুস্থ মনের প্রভাবে তিনি শিশুদের মনে সঞ্চারিত করলেন

সহকর্মেরই। শিক্ষার সঙ্গে চলত উপাসনা; শিশুদের মনে তিনি জাগিয়ে দিতেন ঈশ্বরবিশ্বাস। উপাসনা আর কর্তব্যের মেলবন্ধনে দিয়ে তিনি গড়ে তুললেন শিশুদের নৈতিক জীবন। অল্পদিনেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল একজন আদর্শ শিক্ষিকা হিসেবে। ব্রিস্টল সমাজেতে তিনি হয়ে উঠলেন পারদর্শিনী

উইম্বলডন হয়ে উঠল মার্গারেটদের স্থায়ী বাসস্থান। সেখানকার ছোট্ট স্কুলটি তাঁর জীবন আনন্দে ভরে তুললো। জীবনে এই প্রথম তিনি এমন একটা কাজ পেলেন যার মধ্যে মার্গারেট তন্ময় হয়ে গেলেন। তাঁর মধ্যে ছিল দৃঢ়তা ও কাজ করার অফুরন্ত শক্তি, আর উৎসাহ তো ছিলই। এইভাবে যথেষ্ট হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর তাঁর ইচ্ছা হলো, তিনি নিজেই একটা স্কুল স্থাপন করে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন। তাঁর এ চিন্তা সেই সময়। উইম্বলডনেই একটা স্কুল খুললেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ। ক্রমে তিনি লন্ডনের জ্ঞানী-গুণীদের সমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। স্কুলের নাম দিলেন 'রাস্কিন স্কুল'। স্কুলটি অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করল।

লন্ডনে আসবার পর থেকে এখানকার বিদগ্ধ সমাজ আয়ারল্যান্ডের দুহিতা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে সাগ্রহে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নিলো। লন্ডনের শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে লেডি রিপনের তখন খুব নাম। তাঁর স্কুলের এক শিক্ষকের মাধ্যমে লেডি রিপনের সঙ্গে মার্গারেট পরিচিতা হলেন। লেডি রিপনের বৈঠকে মার্গারেটের আসা-যাওয়া নিয়মিত হয়। এখানে শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতো। লেডি রিপনের এই বৈঠকেই প্রথম মার্গারেটের

চেলসীর সেসেমি ক্লাবে পরিণত হয়। পরে মার্গারেট ঐ ক্লাবের সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। ক্লাবে নিয়মিত শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে নারীজাতির বিভিন্ন সমস্যা এবং রাজনীতি প্রভৃতি সকল আলোচনায় মার্গারেট শুধু যে অংশগ্রহণ করতেন তা নয়, বরং এসব ব্যাপারে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। বার্নার্ড শ, হাক্সলী প্রভৃতি নামজাদা লেখক ও বৈজ্ঞানিক সেসেমি ক্লাবে এসে মাঝে বক্তৃতা দিতেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ও আলোচনার ফলে মার্গারেটের চিন্তা-শক্তি বেড়ে যায়। মার্গারেটের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচারশক্তি দেখে তাঁরাও বিস্মিত হতেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে ~~[illegible]~~ ইংলণ্ডের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চিন্তা ও আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল ডোভার স্ট্রীটের সুন্দর পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত এই সেসেমি ক্লাব। এই ক্লাবেরই এক সম্মেলনে একদিন মার্গারেটের সঙ্গে লেডি ইজাবেল মার্গেসনের দেখা হলো। শিশুশিক্ষা বিষয়ে তাঁরও খুব আগ্রহ ছিল। এই ব্যাপারে তাঁদের দুজনার চিন্তা এক খাতেই বইত। এইভাবে লণ্ডনের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে মার্গারেট যখন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তখন একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর জীবনের পরিধির মধ্যে এসে পড়লেন স্বামী বিবেকানন্দ। সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায় মার্গারেটের জীবনের গতি।

এইখানে আরো একটি কথা বলবার আছে। এই কয়বছর জীবনে যে সফলতা তিনি লাভ করেছিলেন তা ~~[illegible]~~ কিন্তু পরিপূর্ণ চিত্তের এনে দিতে পারেনি — পারেনি তাঁর মনকে ভরিয়ে তুলতে। তাঁর অন্তরে চলছিল একটা

আলোড়ন। কিসের আলোড়ন? আমরা দেখেছি, ছেলেবেলায় ধ্যান ও ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল একটা সহজ বিশ্বাস ও অনুরাগ। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে প্রখর বিচারবুদ্ধি যত জাগতে থাকে ততই দেখা দেয় সংশয়। ধর্মজীবনের ওপর ভিতরের নির্দেশ তাঁর মোটেই ভাল লাগছেনা। অনুষ্ঠানগুলি মনে হচ্ছে প্রাণহীন। উদাসীনতার বিন্দুমাত্র নেই তার মধ্যে। মাঝে মাঝে তিনি ভাবিয়া যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলেন। সংশয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি নানা রকম বই পড়লেন, আলোচনা করলেন অনেক চিন্তাশীল লোকের সঙ্গে। এমন-কি বিজ্ঞান ও দর্শনের মাধ্যমে চেষ্টা করেছেন সংশয়জাল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।

কিন্তু এসব তাঁকে নিশ্চয়তা দিতে পারেনি ধর্ম সম্বন্ধে।

দিতে পারেনি প্রকৃত সত্যপথের সন্ধান।

যখন তিনি সংশয়-দোলায় দুলছেন, তখন মাঝে মাঝেই কেবলই মনে হতো, পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ কি নেই যিনি প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারেন?

জীবনের এই পরম সন্ধিক্ষণে তিনি সাক্ষাৎ পেলেন তেমন একজন মানুষের যিনি মার্গারেটকে সব সংশয় ও দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে যথার্থ সত্যলোকের সন্ধান দিয়েছিলেন। এই মানুষ স্বামী বিবেকানন্দ — তাঁরই প্রতীক্ষা ও দীর্ঘ দেবতা। তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তাঁর জীবনের গতি কিভাবে পরিবর্তিত হয়, এইবার আমরা নিবেদিতা-জীবনের সেই আশ্চর্য কাহিনী বলব।

#space#

স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ মার্গারেটের জীবনের একটি অসাধারণ ঘটনা। আর তারপরেই যে তাঁর জীবনের গতি এক নতুন খাতে বইতে শুরু করেছিল। প্রথম দিনেই যে সেই লণ্ডনে নবাগত হিন্দুযোগীর বক্তৃতা শুনে এই আইরিশ কুমারী যে খুব বা অভিভূত হয়েছিলেন, তা নয়। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক বা মুক্তিফৌজের (salvation army) অতিথি বক্তারা যেমন সংসারের লোককে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করবার জন্য আহ্বান করে থাকেন, মার্গারেটের মনে হলো, প্রাচ্য দেশের এই তরুণ প্রচারকও হয়ত সেইরকম একজন হবেন। সকলকে তিনি ধর্মের নামে আহ্বান করছেন। কিন্তু তাঁর আহ্বানে সমস্ত দেহমন সাড়া দেয় কেন?

তারপর দিন কয়েক ধরে এক-এর পর এক ঘরোয়া বৈঠক থেকে বাড়ি ফিরে রাতের নিস্তব্ধ [illegible] অবসরে হিন্দুযোগীর কথাগুলো আর একবার তাঁর মনের মধ্যে আলোচনা করে দেখলেন মার্গারেট। সত্যিই কি তিনি একজন অত্যুৎকৃষ্ট ধর্মপ্রচারক? তাঁর কথার মধ্যে কি নতুনত্ব কিছু নেই? এমন কি ছিল যা তিনি আগে শোনেন নি বা বুঝতে পারেন নি? ইনি তো কেবল বড় বড় ভাবের ব্যাখ্যা করলেন না, এঁর মুখের কথাগুলো তো মুখস্থ-করা কথা বলে মনে হলো না। আর একবার তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য প্রবল আগ্রহ বোধ করলেন। শীঘ্রই সে সুযোগ হলো। কাগজে দেখলেন পিকাডিলির প্রিন্সেস হলে সেই হিন্দুযোগী প্রকাশ্যে বক্তৃতা করবেন।

মার্গারেট চললেন বক্তৃতা শুনতে। এসে দেখেন লণ্ডনের অনেক চিন্তাশীল লোক বক্তৃতার সভায় এসেছে। অসীম আগ্রহে শ্রোতারা বসে আছেন। যথাসময়ে সেই হিন্দুযোগী এসে বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়ালেন। সকলের দৃষ্টি অমনি নিবদ্ধ হয় তাঁর ওপর।

মার্গারেটও চেয়ে দেখলেন। দেখবার মতো আকৃতি বটে। ফুটন্ত পদ্মের মতো সুন্দর মুখ। সেই মুখ থেকে গাম্ভীর্য ও প্রফুল্লতার লাবণ্য ঝরে পড়ছে। স্নিগ্ধোজ্জ্বল ললাট। আয়ত চোখ দুটির দৃষ্টি আনন্দময়। সমস্ত মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত তপস্যা, পবিত্রতা, সংযমের জ্যোতি আর অপার্থিব সৌন্দর্য। চোখ, নাক ও মুখের গঠন পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় বহন করছে। মাথায় গৈরিক রঙের পাগড়ি, সমস্ত দেহে গৈরিক রঙের সুন্দর একটি লম্বা জামা। যেমন দেদীপ্যমান মূর্তি, তেমন দৃঢ় পৌরুষব্যঞ্জিত রূপ সচরাচর দেখা যায়না।

সন্ন্যাসী বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। বক্তৃতার বিষয়: আত্মজ্ঞান। মধুর, গম্ভীর কণ্ঠস্বর। উচ্চারিত প্রতিটি কথায় দুর্লভ বুদ্ধির দীপ্তি। আর সব শ্রোতাদের মতো মার্গারেটেরও মনে হলো, এতো ধর্মের মামুলি কথা নয় — যেন সাগর-তরঙ্গের মহান লীলা। কী আশ্চর্য যুক্তি, মনীষা, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ছটা! আর কী প্রচণ্ড শক্তি উচ্চারিত সেই কথার — মনের ভিতর দিয়ে একেবারে মর্মে গিয়ে সাড়া তোলে, নিয়ে যায় শ্রোতার মনকে কোন্ এক সুদূর অনন্ত আনন্দের শান্তিলোকে। জলপ্রপাতের মতো সন্ন্যাসীর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে অবিরাম বক্তৃতার ধারা; কথার মাঝে মাঝে উচ্চারিত হয় সুমধুর সংস্কৃত শ্লোক। [illegible] [সবচেয়ে মুগ্ধ – ঐশ্বর্য] বক্তার ইংরেজি যেমন বিশুদ্ধ, তেমনি বিশুদ্ধ উচ্চারণ। শ্রোতারা।

তারপর মার্গারেট স্বামীজির আরো দুটো বক্তৃতা শোনেন। প্রথমবার আমেরিকা থেকে লণ্ডনে এসে তিনি খুব বেশিদিন ছিলেন না। ১৮৯৬ সালের ২৭শে নভেম্বর তিনি আবার আমেরিকা যাত্রা করেন। পরের বছর, (^ এপ্রিল মাসে) স্বামীজি

আবার লণ্ডনে এলেন। এবারেও নানা জায়গায় তাঁর বক্তৃতার আয়োজন হয়। অনেকের বৈঠকখানা ও ক্লাবেও তিনি বক্তৃতা ও আলোচনা করলেন। এখানে অনুরূপ সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তরের ক্লাস হতো। মার্গারেট এর কোনটাই বাদ দিতেন না। প্রশ্নোত্তরের ক্লাসগুলো খুব জমে উঠত, কারণ ঐ সময় সবাই স্বামীজিকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করবার সুযোগ পেতেন। ঐ ক্লাসগুলিতে সবচেয়ে মনোযোগী ছাত্রী ছিলেন মার্গারেট। তা বলে তিনি নীরব শ্রোতা ছিলেন না, বরং সবসময় তাঁর চেষ্টা ছিল, নানা রকম যুক্তি দিয়ে স্বামীজির মতগুলিকে খণ্ডন করা। ভাল করে জানবার জন্যই তিনি বক্তার সব কথায় সংশয় প্রকাশ করতেন।

একদিন সোজাসুজি তিনি সন্ন্যাসীকে বললেন, আপনার সব কথা যে সত্য বলে মেনে নিতে পারি, আমার প্রকৃতি কিন্তু সে রকম নয়।

— এ খুব ভাল কথা। বিচার না করে আমি কোন কথাই কাউকে গ্রহণ করতে বলি না।

— আপনার অনেক কথায় সংশয় জাগে।

— এই রকম সংশয় ভাল। যাচাই করে, পরীক্ষা করেই তো সত্যকে গ্রহণ করতে হয় আর এইভাবে গ্রহণ করতে পারলেই তা স্থায়ী হয়।

— ঈশ্বরের সব কথা আপনি জানেন?

— হাঁ। আমি শাস্ত্রের কোথায় কি আছে, তা তন্ন তন্ন করে জানি

মার্গারেট আর তর্ক করেন না।

২ স্বামীজি

আর একদিন আর একটি সভায়, বক্তৃতা শেষ হলে পরে, মার্গারেট দেখলেন, এক বৃদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত বিবেকানন্দকে সোজাসুজি বললেন, আপনি বড় সুন্দর বলেছেন, কিন্তু নতুন তো কিছু বলেন নি।

— বন্ধু, আমি যা বলেছি তা আর কিছুই নয় — সত্য। এই সত্য হিমালয়ের মতো প্রাচীন, মনুষ্যজাতির মতো প্রাচীন, সৃষ্টির মতো প্রাচীন এবং পরমেশ্বরের মতো প্রাচীন।

প্রশ্নকর্তা আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন না।

এই দেখে মার্গারেটের মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়।

হৃদয় তাঁর জীবন-দেবতার চরণে লুটিয়ে পড়তে চাইলো।

আর একদিনের একটি ঘটনা। লণ্ডনের এক ভদ্রলোকের বাড়িতে বৈঠক বসেছে। মার্গারেট সেই বৈঠকে উপস্থিত। বক্তৃতার শেষে স্বামীজি আরম্ভ করলেন নানা দেশের নানা শহরের আলোচনা — আলোচনা করলেন কত দেশ, কত জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস। কথায় কথায় আসে ভারতের প্রসঙ্গ, এর প্রাচীন তীর্থ ও বিখ্যাত শহরগুলির কথা। বললেন ভারতের উন্নতি-অবনতির ইতিহাস। সন্ন্যাসীর মধ্যে মার্গারেট যেন দেখতে পেলেন জ্বলন্ত ইতিহাস-[illegible]। শ্রোতাদের একজন তখন বলে উঠেন, কিন্তু লণ্ডনের মতো শহর পৃথিবীর মধ্যে আর দুটি নেই। যেমন সুন্দর, তেমনি শিক্ষা, সভ্যতা ও শিল্প-সম্পদের কেন্দ্র এই আমাদের শহর।

মার্গারেট ভেবেছিলেন, এর উত্তরে সন্ন্যাসী হয়ত বিশেষ কিছু

বলতে পারলেন না, যদিও ভারতকে ছোট করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই কথা বলেননি। মুহূর্তে দৃপ্ত কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলে উঠেন, হাঁ, নিশ্চয়ই স্বীকার করি। তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। অতুলনীয় শহর তোমাদের এই লণ্ডন। কিন্তু ভুলে যাও কেন যে তোমাদের এই শহরকে সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করতে পৃথিবীর কত দেশ কত জাতের সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে। জেনে রাখো, ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের মূলে আছে ভারতের অপরিমিত সম্পদ যা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে অবাধে লুণ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের জন্যই তো ইংলণ্ডের এই সমৃদ্ধি, এর রাজধানী লণ্ডনের এই সৌন্দর্য। এ ইতিহাসের কথা।

স্বামীজি চুপ করলেন। মার্গারেট এই নিদারুণ কশাঘাতে চমকে উঠলেন। প্রথম অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে এই প্রথম।

সেসেমি ক্লাবের পক্ষ থেকে মার্গারেট একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে অনুরোধ করলেন তাঁদের ক্লাবে একটা বক্তৃতা দেবার জন্য। তিনি রাজী হলেন। সেখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল: শিক্ষা। সেইদিনের বক্তৃতায় ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর আলোচনা করে বিবেকানন্দ বলেছিলেন: শিক্ষার উদ্দেশ্য কতকগুলো বই মুখস্থ করা নয়, চরিত্রগঠনই শিক্ষার প্রকৃত ও একমাত্র উদ্দেশ্য। জগতে চরিত্রবলেরই দরকার। শিক্ষার দ্বারা সেই চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। মানুষের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাকে জাগিয়ে তোলার নামই শিক্ষা। ক্লাবের সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে শিক্ষা সম্বন্ধে এমন সুন্দর জ্ঞানগর্ভ কথা তাঁরা আর কখনো শোনেননি বা কোন বইতেও পড়েন নি।

ক্রমে মার্গারেটের চিন্তাধারাও পরিবর্তন ঘটতে লাগল। যখন তিনি বুঝলেন, সত্যিকারের ধর্মীয় জ্ঞান কাকে বলে। তাঁর সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল এই হিন্দু যোগীর আদর্শকে অনুসরণ করবার জন্য। তিনি যেহেতু মনে মনে তিনি স্বামীজিকে আচার্য (Master) বলে মেনে নিয়েছিলেন। এমন কি ভারতবর্ষের প্রতিও তিনি যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। এক-দিন অক্সফোর্ডের ক্লাসে দুঘণ্টা প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের পর হঠাৎ বিবেকানন্দ স্বামী বজ্রনাদের মতো শ্রোতাদের চমকিত করে বলে উঠলেন: 'জগতে আজ কিসের অভাব জানো? জগৎ চায় এমন কিছু নরনারী, যারা সদর্পে পথে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল। কে কে যেতে প্রস্তুত?'

কথাগুলো বলতে বলতে স্বামীজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ও শ্রোতাদের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হলো, তিনি যেন ইঙ্গিত করছেন কাউকে তাঁর সঙ্গে সামিল হতে। তাঁর সেই বজ্রগম্ভীর আহ্বান মার্গারেটের হৃদয়ে তীব্র আঘাত করল। তাঁর মনে হলো তিনি উঠে দাঁড়াবেন। স্বামীজি আবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন: 'কিসের ভয়? যদি ঈশ্বর আছেন, এ সত্যি হয়, তবে জগতে আর কিসের প্রয়োজন? আর যদি এ-কথা সত্যি না হয়, তবে আমাদের জীবনেই বা মূল্য কী?'

ক্লাস শেষ হয়ে গেল। সন্ন্যাসীর ঐ আহ্বান মার্গারেটের কে কানে বাজতে লাগল। স্বামীজির আদর্শে জীবন উৎসর্গ করবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। নিজেদের মধ্যে তিনি কি এমন হতে পারেন না? মনের এই

তার নিয়ে একদিন তিনি স্বামীজীর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করলেন। তখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বললেন, আমার দেশের মেয়েদের জন্য উন্নতির আমার অনেকগুলো পরিকল্পনা আছে। আমার মনে হয়, সেগুলো কাজে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারো।

— আপনার কাজে আমি যোগদান করতে রাজী আছি।

— শুধু রাজী হলে চলবে না, আরও বেশি কিছু দরকার।

— হাঁ, আমি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তবে একটা প্রশ্ন আছে।

— কী প্রশ্ন?

— আপনার আদর্শটি আসলে কী, সেটা আরো পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই।

এর কয়েকদিন পরেই স্বামীজি মার্গারেটকে একটি চিঠিতে তাঁর আদর্শের কথা লিখে জানালেন। সেই চিঠিতে অনেক কথার মধ্যে এই কথাটি ছিল: 'তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে।' চিঠি পড়ে মার্গারেট মুগ্ধ, অভিভূত। বুঝলেন সন্ন্যাসীর, তেজ অন্তর ধর্মের মাঝে, মানুষের ভিতরকার দেবত্বের মাঝে, পৃথিবীর সকল নরনারীর কল্যাণ কামনায়। সেই আহ্বানে জেগে উঠল এই আইরিশ কুমারীর সকল সত্তা। ভারতবর্ষের নারীজাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে, তিনি দৃঢ় সংকল্প হলেন।

॥ তিন ॥

স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরে গেলেন। লন্ডন থেকে তিনি যখন যাত্রা করেন তখন মার্গারেট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালেন, তিনি স্বামীজির কাজে যোগদান করতে কৃতসংকল্প। তখন তাঁর ধারণা হলো বিদেশিনী এই মেয়েটি তাঁর কাজে সহায়তা করতে পারবে। তবে তখনি তাঁকে সঙ্গে করে তিনি নিয়ে আসেননি। আরো ভেবে দেখার অবসর দিয়ে চলে এলেন।

কলকাতায় ফিরে আসার সাড়ে তিন মাস পরে, গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরের ঠিক উল্টোদিকে বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন। মঠের নিজস্ব বাড়ি তখনো পর্যন্ত সেখানে তৈরি হয়নি। বিবেকানন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন : মিশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ হলো জনসাধারণের সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান। বিলেত থেকে চলে আসার পর স্বামীজি মার্গারেটকে চিঠি লিখতেন ; সেসব চিঠিতে থাকত মিশনের কর্মকর্মের পরিচয় আর যেসব ছেলেরা সংসার ত্যাগ করে মঠে যোগদান করেছে তারা কেমন করে দুর্ভিক্ষ, ও মানবসেবায় ব্রতী হয়েছে তার বিবরণ।

এদিকে মার্গারেট তখন লন্ডনে বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের বেদান্ত-প্রচার কাজে সাহায্য করছেন। লন্ডনে থাকতেই স্বামীজি ওঁকে চিঠি লিখে ওখানে আনিয়েছিলেন ও ওঁরই উপর কাজের ভার দিয়ে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। উইম্বলডনে মার্গারেট নিজে একটি বেদান্ত সমিতি স্থাপন করে, মাঝে মাঝে সেখানে আগ্রহশীল লোকদের নিয়ে পাঠ ও আলোচনার

ব্যবস্থা করলেন। আবার এখনো বা রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণী পত্র হলো। এইভাবে ইংলণ্ডেই তিনি ভারতবর্ষের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যত দিন যায় ততই তিনি ভারতবর্ষে আসার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। স্বামীজির অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখেন, কিন্তু তিনি নানা রকম চিন্তা করে মার্গারেটকে প্রথমে এদেশে আসবার অনুমতি দেননি। লিখেছিলেন: "এখানকার কাজকর্ম তোমার মতো হবে না, তুমি যে ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, এখানে তার অসুবিধা। বরং তুমি এখানে না এসে ইংলণ্ড থেকেই আমাদের জন্য বেশি কাজ করতে পারবে।"

মার্গারেটের কিন্তু সে কথা মনোমত হয়নি।

তাঁর চিন্তায় এখন শুধু একটি নাম: ইণ্ডিয়া — ভারতবর্ষ।

বত্রিশ নাড়ির টানের মতোই তিনি যেন ভারতভূমির আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন। আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ও সব রকম দুঃখকষ্ট বরণ করতে তিনি প্রস্তুত — এই কথা অকপটে জানিয়ে মার্গারেট স্বামী বিবেকানন্দকে শেষবারের মতো চিঠি লিখলেন। উত্তর এলো:

প্রিয় মিস নোবল,

এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতের কাজে তোমার অশেষ সাফল্যলাভ হবে। ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের মেয়েদের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর — একজন প্রকৃত সিংহীর দরকার। ভারতবর্ষ বর্তমানে মহীয়সী নারীর জন্মদান করতে পারছেনা, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা, সকলের উপর তোমার ধমনীতে

প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সকল দিক দিয়ে সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে। আমি তোমাকে ভারতে আসবার জন্য অনুমতি দিলাম, বৎসে।'

চিঠিতে একটি প্রসঙ্গ ছিল : 'কাজে ঝাঁপ দেবার আগে খুব ভাল করে চিন্তা কর, এবং কাজের শেষে যদি বিফল হও, কিংবা কাজে কখনো বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমি আমরণ তোমাকে সাহায্য করব — তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত-ধর্ম ত্যাগ কর আর ধরেই থাক।'

চিঠি পেয়ে মার্গারেট হল কৃতকৃতার্থ।

জীবনের উদয়াচলে দেখা দিল শুভ অরুণোদয়।

একদিন মায়ের কাছে বসে বললেন : মা, আমি ভারতবর্ষে যাব। তুমি অনুমতি দাও।

— বেড়াতে যাবি? বেশ তো, এর জন্য আবার জিজ্ঞাসা কেন?

— না, মা, বেড়াতে নয়। আমি সেই দেশে গিয়ে চিরকালের মতো কাজ করব, সেই দেশের মেয়েদের সেবায় আমি জীবন উৎসর্গ করব। তুমি আশীর্বাদ কর, মা।

— কোথায় যাবি? সেখানে থাকবি কোথায়? আমাদেরই বা চলবে কি করে?

— গুরুদেবের মতে। তিনি যাবার অনুমতি দিয়েছেন। তোমাদের সব ব্যবস্থা আমি করেছি। সে আর রিচমন্ডের কাছে তুমি থাকবে।

— ও, সেই হিন্দু যোগী! তিনি তোকে তাঁর দেশের মেয়েদের সেবার কাজে গ্রহণ করেছেন, এ যে আমার কতবড় সৌভাগ্য, মার্গারেট। এ কথা এতদিন বলিস নি কেন আমাকে?

— বলিনি পাছে তুমি কষ্ট পাও, রাগ করো।

— কষ্ট! রাগ! কি যে বলিস তুই! তবে বলি শোন। তোর জন্মের আগে থেকেই তোকে আমি ভগবানের চরণে সঁপে দিয়ে রেখেছি। আগে একথা বলিনি। আর যাবার আগে তোর বাবা আমাকে বলে গিয়েছেন—

— বাবা কি বলে... গিয়েছেন, মা?

— তোর বাবা বলে গিয়েছেন, ভবিষ্যতে মার্গারেটের জীবনে উচ্চতর আহ্বান আসতে পারে, তখন যেন আমি তোকে সাহায্য করি। এখন বুঝতে পারছি, তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে তোর জীবনের এই দিকটা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর কথা তো মিথ্যা হবার নয়।

— তাহলে তুমি মত দাও, মা।

— আমি খুশি মনে মত দিচ্ছি। শুধু একটা কথা আমাকে দিয়ে যা।

— কি?

— যেখানেই থাকিস, আমার অন্তিম সময়ে পৃথিবীর থেকে আমাকে দেখে দিয়ে যাস, লক্ষ্মী, মা-টি আমার।

মেরি সর্বান্তঃকরণে তাঁর মেয়েকে ভারতে যেতে অনুমতি দিলেন।

#space#

১৮৯৮, ২৮শে জানুয়ারি।

মম্বাসা জাহাজে চড়ে মার্গারেট ভারতবর্ষে এলেন।

তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ নিজে জাহাজঘাটে উপস্থিত ছিলেন। গুরুকে দেখে মার্গারেট অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করলেন। এই অপরিচিত দেশে তখন একমাত্র স্বামীজিই তাঁর পরিচিত। বহুদূরে সাগরপারে রইল ইংলণ্ড। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্বদেশ-সমাজ সব ছেড়ে মার্গারেট আজ এসে উপনীত হলেন এক সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে। শুরু হয় তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর।

দশ দিন বাদে বিবেকানন্দের আরো দুজন মার্কিন শিষ্যা, মিসেস সারা বুল ও মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড, এলেন ভারতবর্ষে। এঁরা তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুয্যের বাড়িতে। বেলুড়মঠের জমি কেনার পর গঙ্গাতীরে অবস্থিত পুরানো বাড়িটার কিছু কিছু সংস্কার করা হয় ও মার্কিন শিষ্যাদের সঙ্গে মার্গারেট কিছুদিন ঐ বাড়িতে বাস করেন। ভাঙা, ছোট্ট বাড়ি, কিন্তু তার পরিবেশ ছিল মনোরম। অপর তীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও সেখানকার গাছের চূড়াগুলি দেখা যেত। স্বামীজি রোজ সকালে পাশ্চাত্য শিষ্যাদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিতেন। তিনি যখন আসতেন তখন, নিবেদিতার মতে, এই জীর্ণ বাড়িখানি যেন একটি তীর্থে পরিণত হতো। প্রাতরাশের পর ছায়া-শীতল গাছের তলায় বসে বহুক্ষণ চলত স্বামীজির কথা। তন্ময় হয়ে তিনি ভারতবর্ষের কথা বলে যেতেন। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, বেদান্ত,

ইতিহাস, উপকথা, সাহিত্য, কাব্য, জাতীয়বৃত্ত, ভারতবাসীর প্রাত্যহিক জীবনের আচার-অনুষ্ঠান — এইসব নিয়ে আলোচনা করতেন, ব্যাখ্যা করতেন। মার্গারেট ও তাঁর সঙ্গিনীরা শোন, কাল ভুলে তন্ময় হয়ে শুনতেন। শুনতে শুনতে তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত ভারতবর্ষের প্রাচীন স্মৃতিময় ছবি।

দিন যায়। মার্গারেট অস্থির হয়ে ওঠেন।

একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এসেছেন ভারতবর্ষে।

এদেশের মেয়েদের শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। কিন্তু স্বামীজি মোটেই সে প্রসঙ্গ তোলেন না। এমন কি মার্গারেট কাজের কথা তুলতে গেলে উৎসাহ দেন না। কিন্তু মার্গারেট জানতেন না যে, স্বামীজি অপেক্ষা করছেন উপযুক্ত সময়ের জন্য। এদেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার আগে দরকার এই দেশকে জানা — আরো দরকার এই দেশকে ভালবাসা। যে নারীজাতির কল্যাণের জন্য মার্গারেট জীবন উৎসর্গ করতে চলেছে, সেই নারীগণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়া দরকার।

তিনি বিদেশিনী। এই দেশকে ভাল করে না জেনে অথবা না ভালবেসে যদি কাজ করেন তবে তা একেবারেই বিদেশীভাবে হবে। তাই স্বামীজি ধীরে ধীরে মার্গারেটকে শিক্ষা দিয়ে কাজের উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। এটা ছিল সত্যিই অসাধ্য সাধন। ১৮৯৮, ১১ই মার্চ। কলকাতার জনসাধারণের কাছে তাঁর আইরিশ শিষ্যাকে পরিচিত করে দেবার জন্য স্টার থিয়েটারে বক্তৃতার অধিবেশন হয়। স্বামীজি নিজে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। মার্গারেটের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, 'এর আগে ইংলণ্ড আমাদের উপহার দিয়েছিল অ্যানি বেশান্তকে,

ইংলণ্ড আমাদের আর একটি উপহার দিয়েছে — মিস মার্গারেট নোবল। ওঁর কাছে আমাদের অনেক আশা।' ঐ সভায় বক্তৃতা দিতে মার্গারেট সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব' সকলেই মুগ্ধ হয়ে সেই বক্তৃতা শুনলেন।

ইংলণ্ডে থাকতেই তিনি শ্রদ্ধাময়ী সারদাদেবীর নাম শুনেছিলেন। বেলুড়ে এসে এখন তাঁকে দেখবার জন্য মার্গারেটের মন অস্থির হলো। তাঁর বিশেষভাবে অনুরোধের বেশি আর দিন পরে এলো সেই সুযোগ। 'চলো, তোমাদের আজ শ্রীমার কাছে নিয়ে যাবে', এই বলে স্বামীজি বিদেশী শিষ্যা তিনজনকে নিয়ে বাগবাজারে গেলেন। শ্রীমা তখন বাগবাজারে একটা বাড়িতে থাকতেন। তিনি সকলকেই সস্নেহে 'আমার মেয়ে' বলে গ্রহণ করলেন, কাছে বসিয়ে তাদের প্রসাদী মিষ্টি ও ফল খাওয়ালেন।

১৮৯৮। ২৫শে মার্চ।

মার্গারেটের জীবনের আর একটি স্মরণীয় দিন।

ঐ দিন স্বামীজি মার্গারেট নোবলকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দিলেন। মঠের ঠাকুর ঘরে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রথমে মার্গারেটকে দিয়ে শিবপূজা করিয়ে পরে তাঁকে দীক্ষা দেওয়া হয়। দীক্ষাকালে গুরু তাঁর এই শিষ্যার নাম দিলেন 'নিবেদিতা'। মার্গারেটের নবজন্ম হলো। তিনি চিরকালের জন্য ভগবানের চরণে নিবেদিতা হলেন। সেদিনের সেই সকালটি ছিল মার্গারেটের জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সকাল। ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের ইতিহাসে এটা একটা অভূতপূর্ব

আছেন। নিবেদিতার মতো আর কোন পাশ্চাত্য নারী এমনভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে সন্ন্যাসিনী হননি। শুধু ভগবানের চরণে নয়, গুরু তাঁর ঐ শিষ্যাকে ভারতের বেদী মূলেও উৎসর্গ করলেন।

মার্গারেটের ললাটে আঁকা হলো নতুন পরিচয় - ভগিনী নিবেদিতা। ভারত-দুহিতা নিবেদিতা। সেই তাঁর নবজন্মের দিনে গুরু তাঁকে ঐ বলে আশীর্বাদ করলেন:

'জননী-হৃদয় আর সংকল্প বীরের,
মধুময় সুখ স্পর্শ মৃদু মলয়ের,
দীপ্ত শিখা বাধাহীন আর্যবেদী মাঝে
যে পুণ্য সৌন্দর্য রাজে যে শক্তি বিরাজে,
ধ্যানাতীত, স্বপ্নাতীত যাহা আছে আর —
তোমাতে বিলীন থাক- হউক তোমার।
ভবিষ্য ভারত যেন তোমা মাঝে পায়
স্বামিনীরে শিষ্যা-গুরু সেবক সখায়।'

#space#

জন্মান্তর হলো মার্গারেটের।
একই শরীরে দু'বার জন্ম।

১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর আয়ারল্যান্ডের কোলে যাঁর জন্ম হয়েছিল মার্গারেট নামে, আর, ১৮৯৮ সালের ২৫ই মার্চ, ভারতের মাটিতে

তাঁরই দ্বিতীয়বার জন্ম হলো নিবেদিতা এই নামে। পূর্বজন্মের পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবল; নিবেদিতার স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ। নবজন্মের সেই মুহূর্তে আত্মসৃষ্টি এই কন্যাকে ভারতের কল্যাণে নারীজাতির উৎসর্গ করে বিবেকানন্দ তাঁকে বললেন: 'যদি আমার নিজের কোন অভীপ্সিত সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিদানে প্রস্তুত করে থাকি, তবে এই বলি বৃথা হোক; আর যদি এর মূলে সেই পরমাশক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হোক।'

বড় কঠিন প্রকৃতির গুরু ছিলেন বিবেকানন্দ।

শিষ্যকে পরিষ্কার ভাষায় বললেন: 'তোমাকে তোমার আগের জীবন, আগের সংস্কার, আগের অভ্যাসের স্মৃতি পর্যন্ত মুছে ফেলতে হবে। তোমার শরীরের প্রতি বিন্দুতে, প্রাণের প্রতি নিঃশ্বাসে অনুভব করতে হবে যে, তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, ভারতবর্ষই তোমার জাতি। আমার ভারতবর্ষ আজ থেকে তোমার জন্মভূমি হোক।'

মার্গারেটের মৃত্যু হলো।

জন্ম হলো সেই দেহে ভারত-সেবিকা নিবেদিতার।

ফুল হয়ে তিনি ভারতমাতার চরণে তিলে তিলে শুকিয়ে যাবেন। ধূপ হয়ে পলে পলে নিজেকে জ্বালিয়ে করবেন তাঁর আরতি। দীপ হয়ে দিনে দিনে নিঃশেষ করে দেবেন নিজের প্রাণশক্তিকে। এইভাবে তিনি অক্ষরে অক্ষরে সার্থক করবেন গুরুর দেওয়া নাম - নিবেদিতা। এমন করে তাঁর জীবনের বীণায় বেজে উঠবে বৈরাগ্যের রাগিণী।

এই নাটকের মধ্যেই আছে এক বিদেশিনী নারীর আত্মোৎসর্গের এক আশ্চর্য ইতিহাস।

দীক্ষার কয়েকদিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গার ধারে বসে আছেন গুরু ও শিষ্যা। গুরু বললেন, 'যদি তোমাকে ভারতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হয় তবে তোমাকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবে চলতে হবে, এমন কি আহার-বিহার, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা সব বিষয়েই হিন্দুভাবাপন্ন হতে হবে।

— তাই হব। নম্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন নিবেদিতা।

— তোমার ওপর যখন মেয়েদের শিক্ষার ভার দেব ঠিক করেছি, তখন তোমাকে হিন্দু বিধবার মতো সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণী হয়ে জীবন যাপন করতে হবে। তোমার কাজ ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে সমগ্র জাতি ও দেশের প্রতি ছড়িয়ে পড়বে। ভেবে দেখ, তুমি পারবে কিনা।

— আমি পারব।

— তোমাকে এখন চিন্তায়, ভাবে, অভ্যাসে ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ হিন্দু হতে হবে। তুমি সেই রকম পারবে কিনা? ভেতরে বাইরে নিজের জীবনকে একেবারে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর আদর্শে তৈরি করতে পারবে?'

— পারব।

— উত্তম। আরো একটা কথা আছে। তোমার অতীত জীবনটাকে ভুলতে হবে — এমন কি তার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত রাখতে পারবেনা। ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে একটা কথা বলতে পারবেনা। পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করে

(ভিক্ষুণী সুপ্রিয়ার মতো দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে

আমাদের মনুষ্যত্বকে অবলার চোখে দেখতে পারবেনা। (আর্ত ও দুঃখের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে হবে। খ্রীস্টানদের মতো এই ভারতবর্ষের জন্য সমস্ত সুখ জলাঞ্জলি দিতে হবে। এদেশেই তোমার জননী ও ধাত্রী বলে গ্রহণ করতে হবে। বলো, পারবে?

— পারব।

অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন নিবেদিতা।

অন্তরের যে আবেগ, যে চিন্তা নিয়ে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন, তখন থেকে ভগিনী নিবেদিতা সেই আবেগেই অনুপ্রাণিত হলেন। গুরুর চিন্তার সঙ্গে নিজের চিন্তাকে একেবারে মিলিয়ে মিশিয়ে দিলেন। গুরু তাঁর সন্ন্যাসী, তিনিও সাজলেন সন্ন্যাসিনী। দীক্ষার কালে স্বামীজি তাঁকে একটুকরো গেরুয়া কাপড় দিয়েছিলেন। সেইটি তিনি প্রতিদিন ধ্যানের সময় মাথার উপরে চাপা দিতেন। তাঁর অন্তর ও বাইরের নির্মল বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যের কথা স্মরণ করে নিবেদিতাকে চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী বললে ভুল বলা হয়না।

ত্যাগ, সেবা ও কর্মের (সার্থক) জীবন্ত প্রতিমা নিবেদিতা।

তাঁর তপস্যার মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম ভারতের গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে; দেখতে পেলাম শবরীকে। এই বিদেশিনী শিষ্যার মনকে একেবারে প্রাচ্য ছাঁচে ঢেলে গড়বার একটা বিশেষ কারণ ছিল। বিবেকানন্দ ভালো করেই জানতেন যে নিবেদিতাকে দিয়ে এদেশের জন্য কোন কাজ করাতে হলে প্রথমে দরকার এদেশের প্রতি তাঁর মনে আস্থা ও শ্রদ্ধাবুদ্ধি জাগানো। এটা যতক্ষণ না

(এই প্রতিমার নির্মাতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।)

উচিত হচ্ছে তেমন নিবেদিতার পক্ষে এদেশে কাজ করা সম্ভব হবে না। বেদান্ত ও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর এই শিষ্যার আকর্ষণ একটা সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস যা অন্তর অনুভূতির মাত্র কিনা, এটা গুরু প্রথমে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন বলেই কঠিন শিক্ষার ভেতর দিয়ে তিনি নিবেদিতাকে গড়ে তুলেছিলেন।

space

ভারতবর্ষে এসে নবজন্ম লাভের পর বেলুড় মঠে তাঁর জীবন কিভাবে কাটত, সেই কথা নিবেদিতা নিজে চমৎকার বর্ণনা করেছেন:

'আমাদের বাড়িটা কলকাতা থেকে কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে একটু উঁচু সমতল জমির ওপর ছিল। জীর্ণ, ভাঙা একটি বাড়িকে মাঝামাঝি অথচ স্বচ্ছন্দবাসের উপযোগী করে নেওয়া হয়েছিল। জোয়ারের সময় ছোট নৌকোগুলো একেবারে ঘাটের সিঁড়ির নীচেই এসে লাগত। আমাদের এবং ওপারের গ্রামখানির মধ্যে নদীটি ছিল প্রায় এক মাইল চওড়া। তার পূর্বতটে আরো এক মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ও সেখানকার গাছের চূড়াগুলি দেখা যেত। শুনেছি, এই মন্দির ও তার কাছাকাছি বাগানেই স্বামীজি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের তলায় বাস করতেন।

এই বাড়িতেই স্বামীজি রোজ সকালে একাকী, কখনো বা অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই আসতেন। এখানেই গাছতলায় আমাদের সকালবেলার জলযোগ শেষ হবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত আমরা বসে বসে এমনি গুরুজীর মুখে ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কত আলোচনা শুনতাম। সেসব আলোচনা

২ ছিল
২ যেমন গভীর তেমনি সরল। তাঁর এইসব শিক্ষা ও আলোচনার ভেতর দিয়ে ভারত তার অতীতের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আমার দৃষ্টিপথে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠত। ধর্মে, সংস্কৃতিতে, ইতিহাসের গৌরবে এই প্রাচীন দেশ যে এমন মহৎ, এমন সুন্দর তা আগে আমার কিছুমাত্র ধারণা ছিল না। ভারতের সমাজনীতির কথাও তিনি আমাদের বলতেন; তখন এর মধ্যে যেসব কুসংস্কার রয়েছে তার উল্লেখ করতেও স্বামীজি কুণ্ঠিত হতেন না।

কিন্তু বেলুড়ে আমরা শুধু স্বামীজিকেই দেখিনি। সারা মঠই আমাদের অতিথি বলে মনে করতেন। তাইতো দেখতে পেতাম অতিথি-সৎকারপরায়ণ সাধুজন আমাদের কাছে যাওয়া-আসার কষ্ট স্বীকার করতেন। যে গরুটি আমাদের দুধ দিত তাকে তাঁরাই দুইতেন, আর যে ভৃত্যটির ওপর রাতে এই দুধ আমাদের কাছে পৌঁছে দেবার ভার ছিল, সে একদিন পথে গোখরো সাপ দেখে ভয় পায় ও যেতে অস্বীকার করে। সাধুদের মধ্যে তখন একজন এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমাদের গৃহস্থালীর সমস্যাগুলি সমাধান করবার জন্য প্রতিদিন একজন করে ব্রহ্মচারী মঠ থেকে আসতেন। আর একজনের ওপর ছিল বাংলা শেখাবার ভার। মঠের বয়স্ক সাধুগণ প্রায়ই অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন; তাঁদের এই সৌজন্য আন্তরিক ছিল। দেখতাম এই প্রাচীন সন্ন্যাসীদের একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁদের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ। এঁদের সকলেরই বিশ্বাস — স্বামীজিকে দিয়ে জগতের অনেক কাজ হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের।

#space#

১৮৯৮ সালের এপ্রিলের শেষে কলকাতায় হঠাৎ প্লেগ দেখা দিল। বিবেকানন্দ তখন দার্জিলিঙে বিশ্রামের জন্য গিয়েছেন। প্লেগের খবর পেয়ে আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন কলকাতায়; প্লেগ রোগীদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হবে। শহরে তখন খুব আতঙ্ক। প্লেগের জন্য সরকারী নিয়মাবলী জনসাধারণের মনে জাগিয়ে দিয়েছিল এই আতঙ্ক। অনেকেই শহর ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত। মঠে ফিরেই স্বামীজি ডাকলেন নিবেদিতাকে। বললেন তাঁকে একটা আবেদনের খসড়া তৈরি করতে। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা পীড়িতদের সেবায় নামছে — এই ছিল সেই আবেদনের মর্ম।

নিবেদিতা সুন্দর করে আবেদনের খসড়াটি তৈরি করলেন। তার প্রত্যেকটি কথার ভেতর দিয়ে আর্তের জন্য সেবার আহ্বান মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হলো। স্বামীজি নিজে তার বাংলা ও হিন্দী দুটি অনুবাদ করলেন। তাঁর নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশন পীড়িতদের সেবার জন্য অগ্রসর হলো। তখন গুরুভাইরা জিজ্ঞাসা করলেন, টাকা আসবে কোথা থেকে?

— কেন? দরকার হলে মঠের জমি-জায়গা সব বেচে দেব। আমরা ফকির, মুষ্টি ভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা-জমি বিক্রী করলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারা যায়, তবে কিসের জমি আর কিসের জায়গা।

নিবেদিতা এই কথা শুনলেন। ঠাকুরের এক নতুন পরিচয়

। সংস্কারত্যাগী

পেলেন তিনি। তবে, সন্ন্যাসীর কথা নয়, সন্ন্যাসীর ঔদারিকতার অন্তরালে তিনি সেদিন আবিষ্কার করলেন বুদ্ধের মতো এক মানবপ্রেমিককে। বুঝলেন, তাঁর গুরু শুধু শুকনো দার্শনিক চিন্তা নিয়ে কালক্ষেপ করেন না, যা বা লৌকিক উপদেশমাত্র দিয়ে ক্ষান্ত হবেন না। বুঝে যা বলেন, কাজেও তিনি তা পালন করতে পারেন।

এই জীবন্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিবেদিতাও দাঁড়িয়ে গেলেন আর্তের সেবিকারূপে। নিজে ঝাড়ু হাতে নামলেন বাগবাজার পল্লীর রাস্তা পরিষ্কার করতে। সবাই সবিস্ময়ে দেখলেন শিষ্যা তাঁর শুধু কর্মী নন, তিনি যেন চিরন্তনী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, যেন মূর্তিমতী সেবা। স্বামীজির আদর্শে এদেশে ভারতবর্ষে আসবার কিছু মাস পরেই আমরা ভগিনী নিবেদিতাকে নিজের জীবন উপেক্ষা করে প্লেগ রোগীদের সেবায় সানন্দে আত্মনিয়োগ করতে দেখতে পাই। তাঁর এই দৃষ্টান্ত দেখে লজ্জা বোধ করে, বাগবাজার পল্লীর যুবকেরাও অবশেষে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নেমেছিল।

এই প্লেগের সময়েই একদিন দেখা গেল, প্লেগে আক্রান্ত একটি শিশু নিবেদিতার কোলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। এমন নিঃস্বার্থ চিত্তে এই দুরন্ত মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত রোগীর পরিচর্যা করা একমাত্র বিবেকানন্দ-শিষ্যার পক্ষেই সম্ভব ছিল। নিবেদিতা বাঙালির চিত্তজয় করলেন।

॥ চার ॥

'ফুল আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'...

ফুল পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও রেখে যায় তার সুরভি, যে সুরভি বিমোহিত করে সমস্ত জগতকে। এই সুরভি বাতাস বয়ে আনেনা। এই সুরভি মকরন্দে তৈরি। নিজেকে নিঃশেষে বিলোপ করেই ফুল রূপান্তরিত হয় সুরভিতে। তেমনি মার্গারেট ভারতবর্ষের মাটিতে নিজেকে আহুতি দিয়ে মার্গারেট হয়েছিলেন নিবেদিতা। দীক্ষার কালে গুরু তাঁকে যে কথায় আশীর্বাদ করেছিলেন তা নিবেদিতার জীবনে সার্থক হয়েছিল। আয়ারল্যান্ডের মেয়ে মার্গারেট ভারতবর্ষে এসে ভারতীয়দের সেবিকা, বান্ধবী ও মা হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, 'লোকমাতা'; ঋষি অরবিন্দের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন 'শিখাময়ী'। তাঁকে আমরা এই সব রূপেই পেয়েছি।

ক্রমে স্বামীজির শিক্ষায় নিবেদিতা পূর্ণ হয়ে উঠলেন।

ভারতের মর্মমূলে প্রবেশ করে তিনি এর নতুন রূপ দেখলেন।

দেখলেন, জরাগ্রস্ত, অবমানিত ও পতিত হলেও ভারতীয় জাতির মধ্যে তেজ ও বল দুই-ই আছে।

বুঝলেন, ভারতবর্ষ দরিদ্র হলেও, তবু আর্য ঋষিদের স্মৃতিপূত এই তপোবনদেশ অতি নির্মল ও পবিত্র। ত্যাগ এই দেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, দারিদ্র্য তাই এখানে পাপের আকর নয়।

জানলেন, ভারতবাসীর চিত্তবীণায় সর্বদা ধ্বনিত হচ্ছে সেই অমৃতমন্ত্র, সেই মহতী শাশ্বতী বাণী: সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

গুরুর চোখ দিয়ে ও গুরুর ভক্তি দিয়ে নিবেদিতা দেখেছেন ভারতবর্ষকে। তাইতো তিনি প্রাণভরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভারতের ধর্ম, সভ্যতা, সমাজ ও পরিবার। রামকৃষ্ণ যেমন গড়েছিলেন নরেন্দ্রনাথকে, বিবেকানন্দও তেমনি নিবেদিতাকে তাঁর বিরাট চিন্তার ও কাজের সহায়িকারূপে গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষা-দান শুধু বেলুড়ে বসেই হয়নি। ভারতের ভৌগোলিক রূপের সঙ্গে শিষ্যার প্রত্যক্ষ পরিচয় করে দেবার জন্য স্বামীজি মে মাসের মাঝামাঝি নিবেদিতাকে নিয়ে উত্তর-ভারত ভ্রমণে বের হলেন। ঘর-বাঁধা উপাসনা নিবেদিতার জন্য নয়, তাই গুরু বুঝলেন। নিয়ে গেলেন তাঁকে তীর্থে।

নিবেদিতা দেখলেন, কি বিচিত্র পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ! সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা, অসংখ্য নদ-নদী-বিধৌত ভারতভূমি। ভারতমাতার চরণ তলে অসীম-অতল মহাসাগর অধীর আবেগে যুগ-যুগান্ত ধরে প্রবাহিত হচ্ছে, আর কীর্তিজননীর শুভ্রতুষারাবৃত হিমাদ্রি যোগাসনে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন। দেবাদিদেব মহাদেব যেন ভারতবর্ষকে নিজের কোলে করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কি অপরূপ রূপ! গুরুর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে বেড়িয়ে ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ দেখতে পেলেন নিবেদিতা। শুধু রূপ দেখা নয়, সেইসঙ্গে গুরুর মুখে শুনলেন ভারতকীর্তির কত শত পুণ্যকাহিনী।

এই ভ্রমণ-প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা নিজেই লিখেছেন:

"মে মাসের প্রথম থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত আমরা কী অপরূপ দৃশ্যাবলীর ভেতর দিয়েই না গিয়েছি! আর যেমন আমরা প্রত্যেকটি

পর একটি নতুন জায়গায় আসতে লাগলাম, কী অনুরাগ আর উৎসাহের সঙ্গেই না স্বামীজি আমাদেরকে সেখানকার যেটি দেখবার সেই বস্তুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রাচীন পাটলীপুত্র থেকেই এই বিষয়ে শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল। রেলপথে পূর্বদিক থেকে কাশীতে ঢুকবার মুখে এর ঘাটগুলির যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তা পৃথিবীর দর্শনীয় দৃশ্যগুলির অন্যতম। স্বামীজি সাগ্রহে তার প্রশংসা করতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে পাটলীপুত্র ও বারাণসীর অতীত সমৃদ্ধি ও গৌরবের বিষয় মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না।

'তারপর আমরা যখন লক্ষ্ণৌতে পৌঁছলাম তখন এখানে যেসব শিল্পদ্রব্য ও বিলাস-উপকরণ প্রস্তুত হয় তিনি সেগুলির নাম ও মর্ম বর্ণনা করে লক্ষ্ণৌর নবাবদের অতুলনীয় বিলুপ্ত শ্রীবৈভব সম্বন্ধেও বহু আলোচনা করলেন। ক্ষেত, খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করার সময় দেখতাম তাঁর কণ্ঠস্বর এমন প্রশান্ত হয়ে উঠত যে তিনি যেন একবারে সমস্ত দেশটার ওই অংশটাকে চিন্তা করতে পারছেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তাদের বাঁধা ধাঁচের নিয়ম অথবা কৃষকবধূর প্রাত্যহিক জীবনের বর্ণনা করছেন— যেমন খুঁটিনাটি সব দেখা।

'সময়ে সময়ে মনে হত যেন স্বদেশের অতীত গৌরবমোহই স্বামীজির প্রবল আসক্তিকে অধিকার করে রয়েছে। একদিন বিকেলবেলায় গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বাতাসের ভেতর দিয়ে তরাই প্রদেশ অতিক্রম করছিলাম, সেই সময় তিনি আমাদেরকে যেন প্রত্যক্ষ করিয়ে দিলেন যে, এই সেই ভূমি—

যেখানে ভগবান বুদ্ধের কৈশোর অতিবাহিত ও বৈরাগ্যলীলা প্রকটিত হয়েছিল। ভারতের প্রতি গ্রাম, প্রতি বৃক্ষ, এমন কি একটা সামান্য প্রাণী পর্যন্ত তাঁর মনে স্বদেশপ্রেমের ভাব উদ্দীপিত করত।'

গুরুর সঙ্গে পাঁচমাস তীর্থভ্রমণ করে নিবেদিতার মনে এই ধারণা দৃঢ় হলো যে, যদিও তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তবু ভারতই তাঁর ধ্যান, ভারতই তাঁর জ্ঞানধ্যান। বুঝলেন, এই সন্ন্যাসী কেবল ভারতের কথাই ভাবেন, ভারতের অগণিত দরিদ্র, বুভুক্ষু নরনারীর জন্য কাঁদেন। আলমোড়াতে স্বামীজির সঙ্গে অ্যানি বেশান্তের দুবার দেখা হলো। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। নিবেদিতার সঙ্গে আলাপ করে বেশান্ত বুঝলেন, স্বামী বিবেকানন্দের এই শিষ্যাটি অন্তঃপ্রাণে সত্যিই ভারত-দুহিতা।

একদিন কথায় কথায় বুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠল। গুরুর মুখে বুদ্ধদেবের মহিমা শুনতে শুনতে নিবেদিতা যেন তন্ময় হয়ে গেলেন। যখন শুনলেন একবার তাঁর ছেলেবেলায় স্বামীজি বুদ্ধদেবের দর্শন পেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁকে দাসানুদাস, তখন নিবেদিতা তাঁর গুরুর মধ্যেই যেন সেই করুণাঘন লোকগুরুকে প্রত্যক্ষ করলেন। এইভাবে কত কথা, কত বিচিত্র প্রসঙ্গের ভেতর দিয়ে গুরু ও শিষ্যার ভ্রমণের সময় কাটত। ইতিহাস পুরাণ থেকে আরম্ভ করে যীশুখ্রীস্ট, বুদ্ধদেব, রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুই বাদ যেত না।

তাঁদের তীর্থভ্রমণের শেষ পর্যায় ছিল কাশ্মীর। ঠিক হলো শিষ্যাকে সঙ্গে নিয়ে তুষার-তীর্থ অমরনাথ দর্শনে যাবেন। শ্রীনগরে এসে ঝিলাম নদীর ওপর নৌকোতে একমাস কাটালেন। গুরুর বিশ্রাম নেই, শিষ্যাকে উপলক্ষ্য করে চলল,

উপকেশাদি সমানভাবেই চলছে। এইখানে একদিন নিবেদিতার এক প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি তাঁকে বললেন, হ্যাঁ, শিবই আমার আরাধ্য দেবতা। অল্পবয়সে আমি এই শান্ত সুন্দর ধ্যানমূর্তিরই পূজা করতাম।

নিবেদিতা প্রশ্ন করলেন, আমাদের পুরাণে আছে মহাদেবের জটায় গঙ্গা — এর মানে কি?

— ঐ জটাজালের ভেতর থেকে কলকল ধ্বনি করে গঙ্গা এই পৃথিবীতে নামছেন। এই জলনাদের প্রতীক মানে আছে। শতশত জলপ্রপাত শুধু ঝর ঝর ঝরঝর ধ্বনি করে আকুলভাবে শৈলমালার ভেতর দিয়ে নাচতে নাচতে পৃথিবীর পানে ছুটে চলেছে।

##space##

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের দৃশ্য দেখে নিবেদিতা মুগ্ধ হলেন। তিনি লিখেছেন: 'পথের দৃশ্য অতি সুন্দর। কোথাও বৃক্ষ নিচের বনে গান গেয়ে চলেছে, কোথাও সাধু-সন্ন্যাসীরা আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। পাহাড়ের নীচে মাঝে মাঝে শত শত আইরিশ ফুল ফুটেছে। মাঝে মধুর উপত্যকা ও শস্য ক্ষেত, চারদিকে বরফঢাকা পাহাড়ের পর পাহাড় — তাদের শিখরগুলি পর্যন্ত শাদা। কত প্রাচীন কাহিনী উৎকীর্ণ রয়েছে পাহাড়ের বুকে, এখানে ওখানে কত ধ্বংসস্তূপ। বন্ধুর গিরিসঙ্কটগুলিতে কী মৌন মহিমা!'

অমরনাথের পথে চলেছেন স্বামীজি; তাঁর শিষ্য ... সঙ্গে। নিবেদিতা সবিস্ময়ে দেখেন, হিমালয়ের বরফঢাকা পথের ভেতর দিয়ে শত শত যাত্রী

অমরনাথ গুহার দিকে চলেছে। সে এক অপরূপ দৃশ্য! নিবেদিতা মুগ্ধ চোখে দেখলেন – গেরুয়া চাদর নীচে ভস্মাবৃত দেহ সাধুর দল, সামনে ধুনি জ্বলছে; কেউ ধ্যানে নিমগ্ন, কেউ আলাপ করছেন, কেউবা একমনে মৌন। কত বিচিত্র রকম কত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। কত দেশের কত রকমের নরনারী। কোথাও ভিক্ষা করছে। কোথাও শাঁখ বাজছে, কোথাও সারি পাতে রান্না হচ্ছে, কোথাও অন্ধকার ভেদ করে জ্বলছে মশালের আলো। বাতাসে অবিরাম দুন্দুভির শব্দের ধ্বনি, কারো মুখে হর হর বম্ বম্। নিবেদিতার মনে হলো, ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি এমন অদ্ভুত, পবিত্র মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না।

দীর্ঘ ও দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করে অবশেষে অমরনাথ গুহার সামনে শিষ্যদের নিয়ে বিবেকানন্দ উপস্থিত হলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর চারদিকে ছড়ানো রয়েছে। সামনে রয়েছে ঢাকা সারি সারি পর্বতশৃঙ্গ। বিশাল গুহার ভেতরে তুষারময় শিবলিঙ্গ বিরাজমান। সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করে না। ঐ তুষারলিঙ্গের পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা নিবেদিতাকে মুগ্ধ, বিস্মিত করল। এখান থেকে তাঁরা গেলেন ক্ষীরভবানী – কাশ্মীরের আর একটি পবিত্র স্থান। এটি একটি প্রস্রবণ; এখানে জলস্রোতের সৃষ্টি হয়। এইখানেই নিবেদিতা তাঁর গুরুকে সমাধি মগ্ন হতে দেখেছিলেন।

তীর্থযাত্রা শেষ করে লাহোরের পথে নিবেদিতা নভেম্বর মাসের প্রথমেই কলকাতায় ফিরলেন। লাহোরে রাসলীলা দেখে তিনি খুব আনন্দ পেয়েছিলেন।

Space

১৮৯৮। ১৩ই নভেম্বর। নিবেদিতার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন।

আজ কালীপূজা। তাই সন্ধ্যার পর শহরের এখানে ওখানে, প্রত্যেক বাড়ির ছাদে জ্বলে উঠেছে দীপাবলী। বাগবাজারের একটি ছোট গলির মধ্যেও জ্বলে উঠেছে আলো। জ্ঞানের আলো। শিক্ষার আলো। যে আলো জ্বালিয়েছেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর অক্লান্ত সেবাব্রতের আর শুভ উদ্বোধন। এই দিন, বাগবাজারের ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে আর নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। কলকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই দিনটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

বেলুড় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন সঙ্ঘজননীকে সঙ্গে নিয়ে। শ্রী মা এই স্কুলের উদ্বোধন করেন, স্বামীজির এই ইচ্ছা। গুরুভাইদের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দও উপস্থিত ছিলেন এই স্মরণীয় উৎসবে। প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা হলো। পূজার পরে হোম। তারপর স্বামীজি ঘোষণা করলেন বিদ্যালয়ের শুভ আরম্ভ। শ্রীমা এই বিদ্যালয়ের উপর জগন্মাতা ও দেবী সরস্বতীর মঙ্গলাশীষ প্রার্থনা করলেন ও ভাবী ছাত্রীদের উদ্দেশে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন তাঁর অন্তরের আশীর্বাদ। পল্লীর বিশিষ্ট কয়েকজন ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে উৎসবটি যখন শেষ হয়, তখন স্বামী বিবেকানন্দ 'অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু', এই বলে তাঁর মানস-কন্যাকে আশীর্বাদ করলেন। সারদাদেবী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। স্কুলের নাম দেওয়া হলো ভগিনী নিকেতন। এই স্কুলটিই এখন কলকাতায় নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত। বোসপাড়া লেনে সেদিন দীপান্বিতা সার্থক হয়েছিল।

স্বামীজির সংকল্পিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হলো।

স্থাপিত হলো কালীপূজার দিন নিবেদিতার স্কুলটি। চিন্তা ও পরিশ্রম দিয়ে, স্নেহ ও ধৈর্যের সঙ্গে ওই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টিকে তিনি তিলে তিলে লালন পালন করেছিলেন সেই ইতিহাসই হলো বলতে গেলে নিবেদিতার জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মানসকন্যাকে বেলুড় থেকে নিয়ে এলেন বাগবাজারে। এইখানে একটা বাড়িতে থাকতেন সঙ্ঘ-জননী সারদাদেবী। স্বামীজির ইচ্ছা, নিবেদিতা শ্রীমায়ের কাছেই থাকেন। নিবেদিতারও ইচ্ছা ছিল সেইরকম। সারদাদেবীর বাড়িতে একটা খালি ঘরে বাস করবার অনুমতি পেলেন তিনি। কিন্তু বুদ্ধিমতী নিবেদিতা অল্প দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে বিদেশিনীর পক্ষে এখানে থাকা প্রতিবেশিরা পছন্দ করছেন না।

"মেম সাহেবকে আপনার সঙ্গে থাকতে দিয়েছেন, এটা কি ভালো?"

এই রকম অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা সেদিন সারদাদেবীকে শুনতে হয়েছিল। তাঁর জন্য শ্রীমাকে লোকের কথা শুনতে হয়, এটা নিবেদিতার খুব ভালো লাগল না। সেই অবস্থাটা তাঁর মনকে পীড়িত করে তুলল। তিনি বুঝলেন তাঁরা হিন্দু সমাজ তাঁকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত; তবু তিনি তারই ভিতর এক পাশে একটু জায়গা করে নিতে চেয়েছিলেন। শ্রীমা তাঁর জন্য বিব্রত বোধ করবেন, নিবেদিতা এটা চাইলেন না। গুরুকে তিনি সব খুলে বললেন। তখন স্বামীজি আট-দশ দিনের মধ্যেই শ্রীমায়ের খুব কাছে নিবেদিতার থাকবার জন্য একটা বাড়ি ঠিক করে দিলেন।

দেখতে দেখতে বড়দিনের দিন এসে পড়ল। নিবেদিতা যে বাড়িতে

থাকেন সেখানে মাতালের আলোতে তাঁর কষ্ট হয়। সারদাদেবী মানতে পারলেন না।
নিবেদিতাকে ডেকে বললেন, খুকি, কাশীতেও তুমি আমার ঘরে শোবে। তিনি গা/
আপত্তি করলেন না। শ্রীমায়ের কাছে থাকতে তিনি খুবই সৌভাগ্য মনে করতেন। তিনি
নিজেই লিখেছেন: 'যে বাড়িতে আমি থাকতাম তার তুলনায় শ্রীমায়ের ঘরে
ভাল বন্দোবস্ত ছিল। তখন আমার জন্য আলাদা ঘর নির্দিষ্ট ছিল না; অন্য সকলে
যে ঠান্ডা শাদা ঘরটিতে শুতো, আমিও সেখানে শুতাম। লাল সুরকির
পালিশ-করা মেঝের ওপর সারি সারি মাদুর বিছানো, তার ওপর একটা করে
বালিশ ও মশারি — এই ছিল শোবার আসবাব।'

— খুব কষ্ট হবে, খুকি তোমার।

— না, মা। আপনার কাছে কাছে থাকব, এটাই তো লাভ।

বিবেকানন্দের যোগ্য শিষ্যা বটে!

Space

ঐ গাঁয়ের বিকালবেলা।

সারদাদেবী আর নিবেদিতা নিমন্ত্রণে চললেন।

সারদামণি ও তাঁর সঙ্গে আর যেসব মহিলা এসেছিলেন, সকলে সমস্ত বাড়িখানা
(ঘুরে) ঘুরে দেখলেন। স্থানটি বড়ই সুন্দর ছিল। দুর্গাপূজোর পবিত্র গন্ধে ভরপুর

যেমন আয়োজিত তেমনি পরিচ্ছন্ন। কত সুন্দর ঠাকুরঘর! তাঁরা তো অবাক! শ্রীমা এসে ঠাকুরঘরে বসলেন।

— আজ খ্রীষ্টানদের কি পর্ব হচ্ছে না?

— হ্যাঁ মা — ঈস্টার পর্ব।

— ঐ পর্ব সম্বন্ধে কিছু বলো, শুনি; আমরা শুনি।

ঠাকুরঘরের এক কোণে ছিল ছোট একটা ফরাসী অর্গান। নিবেদিতা ছাত্রীদের নিয়ে একটা ঈস্টারের গান গাইলেন। যীশুখ্রীষ্ট কবর থেকে উঠে স্বর্গে গেছেন — এই ছিল তাদের বিশ্বাস। যদিও ইংরেজি ভাষায় গানটি গাওয়া হলো, তবু এই ভজনটি শুনে সারদাদেবী খুব খুশি হলেন। দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে সেই ঈশ্বর-সন্তানের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। এইটা নিবেদিতার খুব ভাল লাগল। এমনটি নইলে কি শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-সঙ্গিনী তিনি, মনে মনে ভাবলেন নিবেদিতা।

বাগবাজারের বোসপাড়া লেন ছোট্ট একটা গলি মাত্র। কিন্তু কী পরিচ্ছন্ন রাস্তা! নিবেদিতার চেষ্টায় ও যত্নে সেই গলিটার শ্রী দেখে সবাই প্রশংসা করত। স্কুলটা আরো ছোট্ট। তেমনি অস্বাস্থ্যকর। উপরতলার ঘরগুলো ছোট ছোট, ছাদও নীচু। গরমের দিনে দুপুরবেলায় সেই ঘরগুলো এমন গরম হয়ে উঠত যে, কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকলেই অস্থির হয়ে যেত। পাখার ব্যবস্থা ছিল না। সেই ছোট্ট বাড়িতে গরমের দিনে হাত-পাখা হাতে নিয়ে নিবেদিতা ক্লাস করতেন। অসহ্য গরমে তাঁর শাঁখের মতো সাদা সুন্দর মুখটি লাল হয়ে উঠত। মাঝে মাঝে দু'হাত মাথায় চেপে ধরতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, মাথার বড় কষ্ট।

তবু এ কষ্ট তিনি হাসিমুখে স্বীকার করতেন।

স্কুলটিকে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর তপস্যা।

গুরুর আশীর্বাদে সেই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তেজস্বিনী নিবেদিতা।

স্কুল তো আরম্ভ হলো। অভিভাবকেরা মেয়ে দিতে চান না। হিন্দুর মেয়ে যাবে বাইরে পড়তে? তাও আবার মেমসাহেবের কাছে? দু'একটি করে মেয়ে আসে। নিবেদিতার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু আবার বিঘ্ন। টাকার অভাব। তবু তাঁর উদ্যম-উৎসাহের শেষ নেই। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, এই স্কুল থেকেই বেরুবে আদর্শ মেয়ে গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মতো। অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলটা জমে উঠল। ছোট ছোট মেয়ে থেকে আরম্ভ করে পাড়ার বয়স্কা বৌ ও গিন্নী সবাই এসে এই স্কুলের ছাত্রী হয়। দু'একজন বিধবা মহিলাও ছাত্রী ছিলেন। যে যেমন ভাবে শিক্ষালাভ করতে চাইত, ভগিনী নিবাসে ঠিক সেইরকম ব্যবস্থাই ছিল। ভাষা, গণিত, শিল্পকলা, সেলাই ও ছবি আঁকাও শিক্ষা দেওয়া হলো।

একদিন।

একটি ছাত্রী শ্লেটে লাইন টানতে টানতে বলেছিল, লাইন টানছি। ঐ 'লাইন' কথাটি শোনামাত্র নিবেদিতা তার পাশে এসে দাঁড়ালেন ও বললেন, তোমার নিজের ভাষায় বলো। যাকে জিজ্ঞাসা করেন সে-ই ঐ একই কথা বলে — লাইন। কিন্তু কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ যে কি তা ছোট মেয়েদের কেউই ভেবে পায় না।

— সিস্টার, আমরা তো চিরকাল 'লাইন' বলি।

— তোমরা নিজেদের ভাষাও ভুলে গেলে?

তখন হঠাৎ একটি ছাত্রীর মুখ দিয়ে বেরুলো – রেখা।

– রেখা, রেখা। নিবেদিতার আনন্দের সীমা নেই। তিনি যেন একটা হারানো জিনিস খুঁজে পেয়েছেন। বার বার উচ্চারণ করতে থাকেন– রেখা, রেখা। ভাল করে বাংলা শিখবেন, এই তাঁর ইচ্ছা ছিল। সকল কথা তিনি বাংলায় বলতে পারতেন না। তবুও তিনি বাংলা বলতেই ভাল বাসতেন। সুধীরা দেবী সঙ্গে সঙ্গে থেকে সব কথা বুঝিয়ে দিতেন। যখনি কোন ছাত্রীর কাছে একটা বাংলা কথা শুনতেন, অমনি উৎফুল্ল হয়ে বলতেন, মা, আজ তোমার কাছে নতুন কথা শিখলাম। বাংলা ভাষা আমি বড় ভালবাসি।

একদিন। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার স্কুলে এসেছেন। তিনি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, স্কুল কেমন চলছে?

– ঠাকুর আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে।

নিবেদিতা মাঝে মাঝে ছাত্রীদের একসাথে গাড়িতে করে শহরের নানা দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যেতেন। একদিন তিনি কয়েকজনকে যাদুঘর দেখাতে নিয়ে গেলেন। একটানা কাচের ঘরগুলো ঘুরে দেখবার পর ছাত্রীরা ক্লান্ত হয়। তাদের জলতেষ্টা পেল। তিনি তাদেরকে জলের কলের কাছে নিয়ে গিয়ে নিজের ঝোলা থেকে একটা গেলাস বের করলেন। যা তিনি স্কুল থেকে বেরুবার (সঙ্গে) সঙ্গে করে নিয়েছিলেন। তখন সেটি ধুয়ে নিজের হাতে জল ভরে ছাত্রীদের খেতে বললেন।

ছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বড় ঘরের মেয়ে। বয়সও তাঁদের বেশি। তাঁরা ঐ জল খেতে ইতস্তত করলেন। তখন (বছর তেরো-চোদ্দ বয়সের) একটি ছাত্রী এগিয়ে এলো।

তার বেশি হয় কাজের অভিজ্ঞতা ছিল না। আনন্দে যে দলের খেলনাটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে, অমনি ভেঙে সেই দল খেলো। নিবেদিতা তখনি ওর হাত থেকে খেলনাটা নিয়ে নিজে সেটি ভাল করে দিলেন, আর খেলনাটা মাটিতে রেখে দিলেন এবং প্রত্যেককে পর পর নিজের হাতে ধরে খেলতে বললেন। মুখে এতটুকু অসন্তোষের চিহ্নমাত্র নেই; সে মুখ তেমনই স্নেহভরা, তেমনি প্রসন্ন ও প্রীতিপূর্ণ।

স্কুলের পত্তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিবেদিতা। কিন্তু একে গড়ে তোলার কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন সিস্টার ক্রিস্টিন আর সুধীরা বসু। ক্রিস্টিন আমেরিকার মেয়ে। সেইখানেই ১৮৯৪ সনে স্বামীজির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। সেইখানেই তিনি স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও ভারতের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৯০২ সালের প্রথমদিকে ভারতবর্ষে এসে ক্রিস্টিন পরের বছর থেকে নিবেদিতার স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং এদেশের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে স্বামীজির পরিকল্পনাকে নিবেদিতার সঙ্গে রূপ দিতে এগিয়ে আসেন। সিস্টার ক্রিস্টিন এসে যোগদান করার পর স্কুল পরিচালনার অনেকখানি দায়িত্ব নিবেদিতা তাঁর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তেজস্বিনী সুধীরা ছিলেন বাংলার অন্যতম বিপ্লবী দেবব্রত বসুর ছোট বোন। দেবব্রত পরে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নাম নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। দেবব্রত নিজের আদর্শে সহোদরাকে গড়ে তুলেছিলেন এবং দাদার শিক্ষাকেই

নির্ভীকতা, দেশপ্রেম, সকলের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি সবই মিশ্রিত ছিল তাঁর চরিত্রে। স্কুল স্থাপিত হওয়ার আট বছর পরে সুধীরা তাঁর অগ্রজের মতামত নিবেদিতার স্কুলে যোগদান করেন। প্রথম তিনি কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। পরে নিবেদিতা ও ইনিই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নির্বাচিত করেন। এইভাবে দুজনের চেষ্টা ও যত্নের সঙ্গে আরো দুজনের ত্যাগ ও প্রচেষ্টা মিলে গিয়েছিল এবং তারই স্কুলটি দিন দিন উন্নতি হতে থাকে।

#space#

নিবেদিতা শুধু স্কুলের কাজনিয়েই থাকতেন না। তাঁর খ্যাতির পরিধি স্কুলের গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই সতেরো নম্বর বোসপাড়া লেনের ঐ বাড়ীটি বাংলা ও ভারতবর্ষের অনেক শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আকর্ষণ করেছিল। অনেক বিখ্যাত মনীষি ও দেশসেবক নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঐ বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লেডি অবলা বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, ডাক্তার নীলরতন সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশিরকুমার ঘোষ — এঁরা ছাড়াও, নিবেদিতার অনুগত অনেক ইংরেজ ও মার্কিন বন্ধু-বান্ধবী সকলেই আসতেন। এঁরা সকলেই ছিলেন নিবেদিতার গুণগ্রাহী। এইসব মনীষির যাওয়া-আসার ফলে ঐ স্কুল বাড়ীটি সেদিন যেন একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল।

—

॥ পাঁচ ॥

— নিবেদিতা এখনো এলো না কেন?

— বোধ হয় স্কুলের কাজে আটকে গেছেন।

— সন্ধ্যেবেলায় স্কুলের কাজ করতে পারে না। কাউকে একবার ওখানে পাঠালে হয়।

এই কথা বলতে বলতেই নিবেদিতা এসে গেলেন। সেদিন তাঁর আসতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরী হয়েছিল। স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর থেকে নিবেদিতার কাজকর্ম দেখবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে বেলুড় থেকে কলকাতায় আসতেন। শিক্ষার কি সুবিধা-অসুবিধা হচ্ছে, তার খোঁজ-খবর নিতেন এবং কাজে উৎসাহ দিতেন। কলকাতায় এলেই তিনি সাধারণত বলরাম বসুর বাড়িতে উঠতেন। এসেই তিনি বোসপাড়া লেনে ভগিনী নিবেদিতাকে খবর পাঠাতেন। সেদিনও বিকেলে বেলুড় থেকে এসে তিনি যথারীতি খবর পাঠিয়েছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, নিবেদিতা তখনো পর্যন্ত না আসায় স্বামীজি খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

নিবেদিতা এসে গুরুকে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলেন। স্বামীজি একটু কঠোর গম্ভীর স্বরে শুধু বললেন, নিবেদিতা!

সেই স্বর শুনে, নিবেদিতা হাতজোড় করে গুরুর দিকে তাকিয়ে রইলেন; তাঁর দুই চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল ভয় মেশানো সলজ্জ ভাব।

— তোমার আজ আসতে দেরী হলো কেন?

— একজন বন্ধুর সঙ্গে আমি বিকেলে চৌরঙ্গীতে গিয়েছিলাম, নানা জায়গায় ঘোরাঘুরিতে দেরী হয়ে গেল। এসেই এখানে চলে এলাম।

— নিবেদিতা, তুমি এখন ব্রহ্মচারিণী, সন্ধ্যার পর কোন পুরুষের সঙ্গে চলাফেরা কি আলাপ করাও উচিত নয়। সন্ধ্যায় কথকতা করার সময়, আমি থাকলে শুধু প্রণাম করতে আসতে পার। সুতরাং সেখানে আসাও উচিত নয়।

— ভবিষ্যতে আর কখনো এমন হবে না।

স্বামীজি তখন প্রসন্ন মনে দু ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসা করে শিষ্যাকে বিদায় দিলেন। নিবেদিতাকে তিনি এমনি ভাবে গড়ে তুলেছিলেন বলেই না এই গোঁড়া-সেকেলে বোসপাড়া লেনের মধ্যে একটা সামান্য স্থানে বাস করেও সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন। হাজার রকমের অসুবিধা স্বীকার করেও এখানে বসেই একা নিবেদিতা সেদিন একশো নিবেদিতারূপে নানা রকমের কর্মপ্রবাহের সৃষ্টি করেছিলেন।

Space

মঙ্গলে, ২০শে জুন।

স্বামী বিবেকানন্দ আবার পৃথিবী-ভ্রমণে বের হলেন। এবার প্রথমে লণ্ডন যাবেন। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিলেন। টাকার অভাবে স্কুল আর চলছে না; টাকার দরকার। নিবেদিতা টাকা তোলবার জন্য গুরুর সঙ্গে চললেন। 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে চড়ে তাঁরা তিন জন যাত্রা করলেন — স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। সমুদ্রপথ অতিক্রম করবার সময়ে শিষ্যাকে স্বামীজি অনেক রকমে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

একদিন উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠল। স্বামীজি বললেন, আত্ম

অষ্টাদশটি কবিতা, কিন্তু বিশ্বমানুষের গৌরবে এই গ্রন্থ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনের বই বলে যুগে যুগে সমাদৃত। এর একটিমাত্র শ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের গতি বদলে দিয়েছিল।

— এই উপনিষদের বক্তব্য বিষয় কি?

— ব্রহ্মজ্ঞান এর সার কথা; জ্ঞান ও কর্ম। সূর্যমণ্ডলে পুরুষ ও মৃত্যু-কালের চিন্তা এবং অগ্নিদেবতার স্তুতি — এই চারটি হলো এর বক্তব্য বিষয়। আর এতে বলা হয়েছে: ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

— এর মানে কি?

— ঈশ্বর সমস্ত জগৎসংসারকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন, এই কথা যে জানে সংসার তার কাছে বড় নয় আর সে যা ভোগ করে তা ঈশ্বরের দান বলে ভোগ করে — সেই জেনে যে ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করে না. অথবা জেনে মত্ত হয়ে অন্যকে পীড়া দেয় না। পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থ এমন সুন্দর কথা বলতে পেরেছে?

আর একদিন কাশ্মীরে নিবেদিতা তাঁর গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, জীবনের শ্রেষ্ঠ মহিমা কি?

— অনুভূতিলাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ মহিমা।

— এই কথাই কি আপনি প্রচার করে যাবেন?

— হ্যাঁ। এই কথাটির জন্যই আমি গত দু'বছর ধরে পৃথিবীতে প্রচার করে আসছি

১৯০০ সালের ডিসেম্বরে স্বামীজি ভারতে ফিরলেন। অর্থসংগ্রহের জন্য নিবেদিতা ইংল্যান্ডে রয়ে গেলেন, তারপর ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে নিবেদিতা লন্ডন থেকে তাঁর বন্ধু-শিষ্য রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে এক জাহাজে চড়ে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। বাংলার এই বরেণ্য মনস্বীর সঙ্গে তিনি লন্ডনে ১৮৯৯ সালে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। রমেশচন্দ্রও নিবেদিতাকে খুব স্নেহ করতেন।

এপ্রিল মাসেই বিবেকানন্দ অসুস্থ হলেন। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে, আর দেরী নেই, মৃত্যু অদূরে অপেক্ষা করছে। এইসময়ে একদিন তিনি দুজন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে এলেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শিষ্যা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। আস্তে আস্তে দোতলায় উঠে গিয়ে স্বামীজি একটি হরিণের চামড়ার আসনে বসলেন।

— এখন কেমন আছেন?

— ভালো নয়।

— স্বামীজিকে ভালো ছিলেন দেখছি।

— আত্মা অবিনশ্বর, কিন্তু শরীরটা ক্ষয়শীল, জীর্ণ হয়েছে।

এই বলে স্বামীজি একটু হাসলেন— সেই স্নিগ্ধ নির্মল হাসি। স্কুলের জন্য নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। নিবেদিতা স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, নতুন বাড়িতে যাবার সময় আপনি কি এসে আশীর্বাদ করবেন?

— আমার আশীর্বাদ তো সব সময়েই তোমার ওপর রয়েছে। আগামী কাল সকালের দিকে তুমি একবার বেলুড়ে যেও। স্কুল সম্বন্ধে তোমাকে যা করতে হবে তখন বলব।

এরপর একদিন।

মৃত্যুর ঠিক সাতদিন আগে স্বামীজি বাগবাজারে শিষ্যাকে দেখতে এলেন। নিবেদিতা কুশল প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

এমন কথা তো গুরুর মুখে নিবেদিতা কখনো শোনেননি। চকিতে মনে পড়ে যায় পরমগুরুর সেই আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী: "নরেন যখনি জানতে পারবে সে কে এবং কি, তখন তার শরীর থাকবে না।' তবে কি এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে চললো? নিবেদিতা চুপ করে গুরুর কথাগুলি শুনে গেলেন। কিছু বললেন না।

চারদিন পরের কথা। তরা জুলাই নিবেদিতা নিজেই সহসা বেলুড় মঠে গুরুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। স্বামীজি সেদিন নিজের হাতে শিষ্যাকে খাদ্য পরিবেশন করলেন। খাওয়া শেষ হলে নিজেই সস্নেহে হাতে জল ঢেলে দিলেন। চকিতে নিবেদিতার মনে পড়ল— মৃত্যুর আগে যীশুখ্রীষ্ট তাঁর সব শিষ্যের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। বিদায়ের সময় হলো। স্বামীজি মন্ত্রপাঠ করে শিষ্যার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। সেই মুহূর্তে নিবেদিতা অনুভব করলেন, গুরু যেন তাঁর দিকে স্নেহভরে অসীম তাকিয়ে রয়েছেন। আর কোন কথা হলো না। পৃথিবীতে গুরুর জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার এই শেষ দেখা।

১৯০২। ৪ঠা জুলাই। শুক্রবার।

রাত ন'টার সময় বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী, শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। পরের দিন সকালেই মঠ থেকে এক পত্রবাহক এই দুঃসংবাদ বহন করে নিবেদিতার কাছে এলো। চিঠিখানি পড়ে

তাঁর সমস্ত অন্তর থেকে, শুধু একটা অস্ফুট আর্তনাদ উঠল। সেই দুঃসংবাদের মধ্যেই
তিনি ঝড়ের মতো বেগে বেলুড় অভিমুখে ছুটলেন। এসে দেখেন সমস্ত মঠ
নিস্তব্ধ। সকলেই চুপচাপ। নিবেদিতা একেবারে উপরে স্বামীজির ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন
মেঝের উপর হলুদরঙের ফুলে ভরা স্বামীজির মৃতদেহ শায়িত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স
যেন মহাধ্যানী মগ্ন হয়ে আছেন মহাধ্যানে। কোনো কথাও না বলে নিবেদিতা, গুরুর সেই পার্থিব
দেহের পাশে বসলেন; নিজের কোলে তুলে নিলেন তাঁর মাথাটি। তারপর একখানা হাত-
পাখা নিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর মুখে বাতাস করতে লাগলেন।

সে মূর্তি ধীর স্থির। একেবারে নিস্তরঙ্গ। চোখে জল নেই; ঠোঁট একটুও
কাঁপছে না। যেমন একমনে স্নেহময় প্রেমময় গুরুর নিষ্প্রাণ দেহে পাখার বাতাস করতে ধীর
লাগলেন। নিবেদিতার হয়তো মনে পড়ল, অমরনাথে গুরু তাঁকে বলেছিলেন, 'শিব
আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছেন।' এই কি সেই ইচ্ছামৃত্যু? গুরু নেই, কিন্তু শিষ্যার
অন্তরে বেজে চলেছে তাঁর সেই আশ্বাস-বাণী: আমি মৃত্যু পর্যন্ত তোমার পিছনে
থাকব। নিবেদিতা তাই বিন্দুমাত্র শোক প্রকাশ করলেন না।

ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী বীরের চিতার আগুন নিভে গেল।

সেই চিতার আগুন থেকে প্রেরণা পেয়ে ফিরে এলেন নিবেদিতা।

গুরুর তেজ দিয়েই তিনি পেয়েছেন ভারতকে — নিজের সত্তাকে
একেবারে মিশিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় সত্তার সঙ্গে। গুরুর ভারতমন্ত্র আর থেকে
হবে তাঁর জীবনের মন্ত্র। বললেন, স্বামীজি আমাদের একটা কাজের ভার দিয়েছেন। আমাদের
সেটা করতে হবে। তারপর গুরুর কিছু কেশরাশি কুড়িয়ে নিবেদিতা নিঃশব্দে ফিরে গেলেন।

#space#

গুরুর মৃত্যুতে নিবেদিতার শোক করবার সময় ছিল না। বেলুড়ে গঙ্গার তীরে চিতার আগুনে এই জুলাই অগ্নিময় চেতনার যে মূর্ত বিগ্রহটিকে তিনি পুড়ে ছাই হতে দেখেছিলেন, তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার জন্যই শিষ্যা এইবার নিজেকে নিয়োজিত করলেন। বিবেকানন্দের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের আদর্শকে সামনে রেখে, সন্ন্যাসীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনাকে জাতীয় আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনায় পরিণত করবার কঠিন কাজে ব্রতী হলেন নিবেদিতা। গুরুর উপদেশ শিষ্যার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছে, তা মিলিয়ে যাবার নয়। সেই সময় থেকে তিনি স্বামীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে চাইলেন। ভারতবাসীদের তা শেখাবার দরকার ছিল। তাঁর জীবিত-কালে এই ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ অগ্রগামী হয়েছিলেন, তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতার যাত্রা সেখান থেকেই শুরু।

প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার রামকৃষ্ণের একটি জীবনী লিখেছেন। বিবেকানন্দ যখন ইয়োরোপে যান তখন প্রাচ্য অনুরাগী এই মনীষীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন ও তখন তিনি তাঁকে তাঁর ইষ্টদেবের জীবনের কাহিনী, তাঁর অলৌকিক সাধনা ও সিদ্ধির কথা বলেছিলেন। তারই ভিত্তিতে ম্যাক্সমুলার লিখেছেন এই জীবনী। এর একটি সমালোচনা লিখলেন নিবেদিতা। সেটি ছাপা হলো 'স্টেটসম্যান' কাগজে। ভারতের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এই লেখাটি। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নিবেদিতার নাম।

বিবেকানন্দ জানতেন নির্জন তপস্যা তাঁর শিষ্যার জন্য নয়। তাই যে তিনি

লেখার কাজে নিবেদিতাকে উৎসাহ দিতেন। কলকাতায় যখন প্লেগ হলো, অমনি নিবেদিতা কলম ধরলেন — লিখলেন এই বিষয়ে কত প্রবন্ধ, কত রিপোর্ট। সেগুলো তখন নানা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তখন থেকেই কাগজের খবরের কাগজে তাঁর রচনা নিয়মিতভাবে বেরোতে থাকে। 'প্রবুদ্ধ ভারত' মাসিকে কলকাতার বাঙালী হিন্দুদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে নিবেদিতার ধারাবাহিক প্রবন্ধ সেদিন সকলের কাছে খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। গ্রাম্য জীবনের কাহিনী, হিন্দু পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি, বাঙালী হিন্দুর পূজা-পার্বণ — সব কিছু নিখুঁত তুলিতে আঁকতেন নিবেদিতা। এমনি করেই তিনি ইংরেজ পাঠকদের কাছে পরিচিত করে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষকে, ভারতীয় সমাজকে। এসবই তিনি স্কুলের কাজের অবসর সময়ে লিখতেন।

Space

মঠের গণ্ডী ছাড়িয়ে, রামকৃষ্ণসংঘের গণ্ডী ছাড়িয়ে নিবেদিতা নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন সারা বাংলায়। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান জোড়াসাঁকো তাঁকে আকর্ষণ করল। গুরু নিজেই একবার শিষ্যাকে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করবার জন্য। তখন থেকেই তিনি শুনেছেন রবীন্দ্রনাথের নাম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কুলপ্রদীপ — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নব্য বাংলার প্রতিভাধর কবি। মহর্ষিকে দেখেছেন; এইবার মহর্ষি-পুত্রকে দেখবার ইচ্ছা হলো নিবেদিতার।

শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ ফিরেছেন। এই খবর পেয়ে জোড়াসাঁকোয়

এসে নিবেদিতা ওইদিন দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দের এই বিদেশিনী শিষ্যাটির প্রেমে কবিও মুগ্ধ ছিলেন। প্রথম আলাপেই দুজন দুজনের প্রতি নিবিড় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বোধ করলেন। দুজনের মধ্যে হয় স্থায়ী বন্ধুত্ব। ক্রমে নিবেদিতা ঠাকুর-বাড়ির একজন অন্য অতিথি হয়ে উঠলেন। সেখানকার আরো অনেকের সঙ্গে হয় তাঁর পরিচয়।

এই সময় মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ বাগবাজারে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। জোড়াসাঁকোর প্রাসাদতুল্য ঠাকুরবাড়ির তুলনায় নিবেদিতার বাসাটি ছিল খুবই সামান্য। বাড়িটার দেয়ালে মাটির লেপ, জানলায় গরাদ নেই, কিন্তু খসখসের পর্দা দেওয়া। তাঁর সেই সজ্জাহীন সাদাসিধে ঘরটিতে নিবেদিতা কবিকে সমাদর করে বসাতেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই অন্তরের গানে আর আনন্দের হাওয়ায় সেই সামান্য ঘরটি যেন মধুময় হয়ে উঠতো। অপরূপ সুমধুর কণ্ঠে কবি তাঁর নতুন কবিতা আবৃত্তি করেন, নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে শোনেন, আবার আবৃত্তিতে তাঁর মন ভরে ওঠে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে কেটে যায়। কবির গীতাঞ্জলি কাব্যের কয়েকটি কবিতা নিবেদিতা এই সময় ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। কবির মধ্যে তখন দেশাত্মবোধকে দেখতে পেয়ে তাঁর প্রতি নিবেদিতার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়।

তাঁর ছোট মেয়েটিকে ভাল করে ইংরেজি শেখাবেন, এই ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের অনেক দিনের। একদিন বিকেলবেলা বোসপাড়ায় নিবেদিতার কাছে গিয়ে কবি তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, আমার ছোট মেয়েটিকে একটু ইংরেজি শেখাবেন? আপনার

ওখানে গিয়েই পড়ে আসবে — সপ্তাহে তিন দিন।

— সে কী? ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের বিলিতি মেম বানাবে?

— ইংরেজি কথাও শেখাতে চাই। আর সেই বয়স পর্যন্ত যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই শিক্ষা।

— কিন্তু বাইরে থেকে যেসব শিক্ষা চাপিয়ে দিয়ে লাভ কি? যাঁরা নিয়েছেন বিদেশী শিক্ষায় নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে চাপা দেওয়া আমি একেবারেই পছন্দ করি নে।

কবি এই কথার, এই যুক্তির আর প্রতিবাদ করলেন না।

কবির নিমন্ত্রণে নিবেদিতা কিছুদিন তাঁদের শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে গিয়ে কাটিয়েছিলেন। পদ্মার তীরে শিলাইদহ। ঠাকুরবাড়ির জমিদারি এখানে। রবীন্দ্রনাথ তখন এই জমিদারির সমস্ত দেখাশোনা করতেন। কবির বন্ধু, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুও মাঝে মাঝে বন্ধুর অনুরোধেই এখানে এসে কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন।

একদিন। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চলেছেন পদ্মার চরে সূর্যোদয় দেখতে। সঙ্গে আছেন জগদীশচন্দ্র। প্রত্যুষের সেই নিস্তব্ধ প্রহরে, নিবেদিতা দেখলেন, চাষীরা লাঙল কাঁধে মাঠে চলেছে। তাদের জমিদার রবীন্দ্রনাথকে তারা দেখেছে অনেকবার। কিন্তু এবার ওঁর সঙ্গে শাদা গাউন-পরা এক মেমসাহেবকে দেখে তারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কোথায় গেল সূর্যোদয় দেখা। নিবেদিতা ছুটে চাষীদের কাছে চলে গেলেন।

— ওই, তোমরা দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

— আমরা মেমসাহেবকে দেখছি।

— মেমসাহেবকে দেখবার কিছু নেই। তোমাদের গাঁ কতদূর?

— ঐ- ঐখানে।

— চলো তোমাদের গাঁ দেখে আসি।

এমন কত ঘটেছে কত। পদ্মার চরে যখন সূর্য উঠলো, নিবেদিতা তেমন চাষীদের কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে চাষী-বৌর সঙ্গে গল্প করছেন। এ তাঁর প্রথমদিনের খেয়াল ছিলনা। যে কয়দিন তিনি শিলাইদহে ছিলেন সেই কয়দিন রবির জমিদারির অন্তর্গত গ্রাম ছিল, সব গ্রামে তিনি ঘুরলেন। শুধু দেখা নয়; এমন গরীব চাষীদের সঙ্গে প্রাণ মিলিয়ে, মন মিলিয়ে ওদের সুখদুঃখের সমভাগিনী হলেন। তাদের সঙ্গে চিড়ে খাইলেন, পান খেলেন, তাদের নাড়ু-মোয়া খেলেন; তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে ওদের জন্য ধন সাহায্য করলেন।

এখানে শিলাইদহের চাষী-গৃহস্থ বাড়ির রান্নাঘর, শোবার ঘর, ঢেঁকিঘর, গরু-বাছুর সব দেখে তাঁর কী আনন্দ! পাড়াগাঁয়ের ছেলেমেয়েদের নিজের হাতে তৈরি কাঁথা, খেলনা, কুলো-ডালা, মাটির পুতুল, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ — এসব বিচিত্র পল্লীশিল্প নিবেদিতাকে মুগ্ধ করত। উৎসাহের সঙ্গে অনেক কিছু সংগ্রহও করলেন। বনবনের ফাঁকে ফাঁকে, পদ্মার [illegible] বাঁকে বাঁকে জেলে-মালো, মাঝি-মাল্লা ও চাষীদের যে সহজ জীবনযাত্রা, শিলাইদহে এসে নিবেদিতা যেন সেই সরল, সুন্দর জীবনের সন্ধান পেয়ে গেলেন।

—

॥ ছয় ॥

নবীন ভারতের আর একটি আলোক-শিখা আকৃষ্ট করল নিবেদিতাকে। তিনি জগদীশচন্দ্র বসু। প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক।

চল্লিশ বছর বয়সেই তিনি হয়েছেন বিশ্ব বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক। বস্তুতঃ প্রথমেই নিবেদিতা এঁর কথা শুনেছিলেন। অবশ্য ১৯০০ সালের প্যারিস প্রদর্শনীতে গুরু নিজে শিষ্যাকে এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেইখানে, বিশ্বের সেই বিদগ্ধ সমাজে, তাঁর গুরুর মতোই তরুণ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রও সেদিন ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন — এ নিবেদিতা নিজের চোখেই দেখেছিলেন। সেদিনের এই স্মৃতি তাঁর মনে জাগ্রত ছিল।

কলকাতায় এসে এই বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে নিবেদিতা দেখলেন, এত খ্যাতিমান, তবু খ্যাতিতে এঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আপন মহত্ত্বে উদাসীন, সত্যান্বেষী ও স্বপ্নদর্শী এই মানুষটিকে দেখে নিবেদিতার কেবলই মনে হত ইনি যেন বিলুপ্ত সমাজের প্রতিভূদেরই সঙ্গে একত্রে যুক্ত হয়ে চলেছেন। তাঁর স্ত্রী, লেডি অবলা বসুকে দেখে তাঁকে তাঁর স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী বলেই নিবেদিতার মনে হয়েছিল। লেডি বসু ও জগদীশচন্দ্র দুজনেই সমান স্নেহ ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন বিবেকানন্দের এই শিষ্যাকে।

আপার সার্কুলার রোডে বৈজ্ঞানিকের বাড়ি। বোসপাড়া লেনের পরেই কলকাতায় তখন এটাই ছিল নিবেদিতার আকর্ষণের অন্যতম স্থান। এখানেও, তিনি দেখতেন, কত জ্ঞানী গুণী ও মনীষীদের আসা-যাওয়া ছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে নিবেদিতার ভারত-অনুরাগই তাঁকে বৈজ্ঞানিকের শ্রদ্ধার পাত্রী করে

ভুলেছিল। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিকের প্রতি নিবেদিতার নিঃস্বার্থ ভালবাসা, অনাবিল স্নেহ, জগদীশচন্দ্র জীবনে ভুলতে পারেননি। এই তাপসীর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার যেন সীমা-পরিসীমা ছিল না। নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে ঠিক ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন, আপনের মতো শ্রদ্ধা করতেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর চেয়ে বয়সে প্রায় দশবছরের বড়ো ছিলেন।

এইসময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্র বসুকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর অপরাধ তিনি ভারতীয়। যোগ্যতার তুলনায় মাইনে খুবই কম। এই কম মাইনে নিতে তিনি অস্বীকার করেন এবং তিনবছর এই নিয়ে এই নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া চলেছিল। সেই অসুবিধার মধ্যেই জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয় নিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মহলে সাড়া পড়ে যায়। বিলাতের রয়্যাল সোসাইটি তখন তাঁকে বৃত্তি দিয়ে সম্মানিত করে। এর পরেই ভারত-সরকারকে জগদীশচন্দ্রের দাবী মেনে নিতে হয় যদিও অনিচ্ছার সঙ্গে।

সেই তাঁর সংকটের দিনে যখন তিনি একাকী সংগ্রাম করছিলেন, তখন একমাত্র ভগিনী নিবেদিতা বৈজ্ঞানিকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিছুতেই তাঁকে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়তে দেননি। মানুষটি ছিলেন নিতান্ত নিঃসঙ্গ — কি কলেজে, কি পরিবারে, কি নিজের পরিবেশের মধ্যে, এবং এই কারণেই জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার কাজে ক্রমে ক্রমে নিরুৎসাহ বোধ করতেন। এটা নিবেদিতা তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। বৈজ্ঞানিকের জীবনের সেই সঙ্কটকালে তিনি যে কতভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তা বলবার নয়। জগদীশচন্দ্রের

প্রতিভা ও শক্তির ওপরে নিবেদিতার বিশ্বাস ছিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পাণ্ডুলিপি নিবেদিতা নিজের হাতে তৈরি করে দিতেন। জগদীশচন্দ্রের বিখ্যাত গবেষণা-গ্রন্থ 'উদ্ভিদের সাড়া'। এই বইটিতে বিবেকানন্দ-শিষ্যার সহযোগিতার স্বাক্ষর রয়েছে। বইতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বলছেন: 'ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন অতিক্রমের এক মহীয়সী নারী। তাঁকে দেখলেই মনে হতো যেন একটি অগ্নিকণা নির্ধূম হোমানলে পরিণত হয়েছে।' অন্যদিকে নিবেদিতা বলছেন: 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তুলবার জন্যই ভগবান জগদীশচন্দ্রকে পাঠিয়েছেন।'

একদিন।

নিজের বাড়ির ল্যাবরেটরিতে বসে জগদীশচন্দ্র কাজ করছেন এক মনে। সাধারণ ছোট্ট ঘর। চেয়ার ও টুলের ওপর যন্ত্রপাতি এখানে-ওখানে ছড়ানো, মেঝেতে টেস্টটিউব আর রাশি রাশি কাগজ। কাজে প্রায় ডুবে তন্ময় হয়ে গবেষণা করছেন বৈজ্ঞানিক। এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন সেখানে। বৈজ্ঞানিক যেন একজন মনের কথা বলার লোক পেলেন। মাইক্রোস্কোপ [illegible] তুললেন।

— জড়ের মধ্যেও প্রাণ আছে, আমি দেখেছি।

— সত্যি?

— হ্যাঁ। কোনো ভুল নেই। জড়ও চৈতন্যময়।

— উদ্ভিদের প্রাণ আছে বলেছেন, ধাতুরও প্রাণ আছে?

— হ্যাঁ — ধাতুও প্রাণবন্ত। একদিন তার নাগাল পাবই। প্রথম গাছপালায়, তারপর পাথরে যে প্রাণ আছে তা প্রমাণ করবই। আছে, আমি জানি।

— আমায় যা বলছেন, আপনার নিজে বলা উচিত।

— সে-কথাটাকে অমিয় রূপ দেব কেমন করে?

— আমি তো আছি।

#১৮৫৫#

নিবেদিতার আর একটি কর্মক্ষেত্র ছিল ডন সোসাইটি।

এইটি ছিল স্বদেশী-সেবার পাঠশালা।

এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯০২ সালে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই নিবেদিতা এর সঙ্গে যুক্ত হন। এই সোসাইটির মুখপত্র 'ডন' (Dawn) ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে সেদিন যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। তৎকালীন সকল খ্যাতনামা মনীষীদের রচনায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন নিবেদিতা। সোসাইটির মঞ্চ থেকে তিনি নিয়মিত বক্তৃতা করতেন। ঐ মঞ্চ হতে তিনি নানা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁরই বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে কতজন যুবক সেদিন দলে দলে স্বদেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করেছিল।

একদিন।

স্বামী সারদানন্দ ডন সোসাইটিতে বক্তৃতা করলেন গীতার উপর। নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। ছেলেরা অনুরোধ করল, সিস্টার, গীতা সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন। নিবেদিতা হেসে বললেন, আমি নিজে গীতার কাছ থেকে কি পেয়েছি, জানো? গীতার মধ্যে আমি দেখতে পাই এক অফুরন্ত শক্তির উৎস। এক হাতে গীতা

আর অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে আদর্শকে কর্মযুক্ত করতে যথার্থ ক্ষত্রিয়
বীর হয়ে মাথা তুলবে?'

এইভাবেই সেদিন ডন সোসাইটির আসর থেকে বাঙালি যুবকের মনে [illegible] উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিলেন নিবেদিতা। তাঁর এইসময়কার বক্তৃতা শুনে মনে হতো যেন শিষ্যার কণ্ঠকে আশ্রয় করে স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার যৌবনশক্তিকে ডাক দিচ্ছেন। নিবেদিতা যখন আবেগভরে বলতেন, 'আসল ভারতবর্ষকে যদি চিনতে চাও তবে আকবর ও অশোকের স্বপ্ন দেখ। বই পড়ে দেশপ্রেম শেখা যায় না'; অথবা তিনি যখন বলতেন, 'স্বামীজি বলে গেছেন, তোমাদের আরাধ্য দেবী এখন ভারতমাতা'—তখন বাংলার তরুণ প্রাণে যে সাড়া জাগত তা অনুভবের জিনিস, ব্যাখ্যা করে বোঝাবার নয়।

এমনি করে ডন সোসাইটিকে নিয়ে, ডন সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়ে নিবেদিতা তাঁরই গুরুর স্বদেশমন্ত্রের অগ্নিশিখা বাংলা তথা সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই ডন সোসাইটির বৈঠকেই তিনি আরো দুজনের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ইনি বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন ও (তখন এঁর নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।) তাঁরা দুজনে একসঙ্গে আমৃত্যু মৈত্রী ও প্রীতি রেখেছিলেন। দুরন্ত ও দুঃসাহসী ভবানীচরণ জীবনের প্রথম থেকেই স্বদেশপ্রেমে ভরপুর ছিলেন। বন্ধুর অকালমৃত্যুর পর, তাঁর চিতার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরই শিষ্যার সামনে ইনিই সেদিন স্বামীজির অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে নিবেদিতা এঁর প্রতি গভীর-ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

#space#

উনিশ শো দুই সালের চৌঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর নিবেদিতা প্রথমেই তাঁর গুরুর কথা চিন্তা করলেন। তাঁর অন্তর ও শরীর তখন হয়ে উঠেছে বিবেকানন্দময় — বিবেকানন্দের আদর্শময় বাণী প্রচার করা হয়ে উঠলো তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। কিন্তু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে তিনি প্রচার করলেন না — সেইভাবে তাঁর গুরুর মহিমাকে তুলে ধরার চেয়েও শিষ্যদের সামনে স্বয়ং নিবেদিতার প্রয়োজনবোধই মনে হয়নি। তিনি তাঁর গুরুকে চিনেছিলেন, বুঝেছিলেন সত্য করে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে যে বিপ্লবী ও স্বদেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ ছিল তাকেই শুধু তিনি বাঙালির কাছে, ভারতবাসীর কাছে নতুন করে তুলে ধরতে চাইলেন।

এর একটা বিশেষ কারণ ছিল। স্বামীজির মৃত্যুর পরে সমস্ত ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে যে রকম শোকের প্রকাশ হয়ে উঠেছিল, নিবেদিতা সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এটাও লক্ষ্য করলেন যে, যে-উদ্দীপনা, যে-উৎসাহ নিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর ঘুমন্ত দেশকে জাগাতে চেয়েছিলেন, তা যেন তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই স্তিমিত হয়ে এলো। ভারতের প্রাণের কথা যাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলত, সেই স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা যেন শূন্যে মিলিয়ে যেতে চলেছে। কেউ আর বিবেকানন্দের নামে তেমন উৎসাহ বোধ করেনা, কেউ আলোচনা করেনা তাঁর অগ্নিময় আদর্শ নিয়ে।

নিবেদিতা গভীরভাবে এইসব কথা চিন্তা করলেন।

বুঝলেন এখন দরকার বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর বিশ্লেষণ ও প্রচার। উজ্জ্বল স্বপ্ন দুই চোখে নিয়ে তিনি এখন ভারতবাসীর কাছে গুরুর

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বমানবতাবোধের বাণী পৌঁছে দিতে খুব ব্যস্ত হলেন। গুরুর ছবিতে ফুল-চন্দন দিয়ে শ্রদ্ধাপূজা করলেন না তিনি। প্রথম দিব্য প্রেরণা অনুভব করলেন তাঁর মনের মধ্যে। সেই প্রেরণা যেন সেদিন তাঁকে, ঘরের কোণ থেকে দেশময় ছড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। 'স্বামী বিবেকানন্দই আমাদের প্রথম জাতীয় নেতা' — সোচ্চার কণ্ঠে এই কথা তিনি প্রত্যেকটি সভায় বলতে লাগলেন। স্বামীজির অবদানের প্রসারের জন্য প্রথমেই তিনি কলকাতায় স্থাপন করলেন বিবেকানন্দ সোসাইটি।

সোসাইটির প্রথম সভায় নিবেদিতা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন: 'ভারতবর্ষ ও সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করে স্বামীজির মনে যে বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধের উদ্ভব হয়েছিল, সেই মতবাদের আলোকে আমাদের বুঝতে হবে। মনে রাখতে হবে, স্বদেশীযুগের ভূমিকে তিনি মাত্র স্পর্শ করে গিয়েছেন, এখন তাঁর স্বদেশপ্রেমের বীজভাবনারা দেশকর্মীর কাছে, বিশেষ করে [illegible] কাছে প্রচার হওয়া দরকার। তবেই না আমরা মানুষ বিবেকানন্দকে পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাব। স্বামীজি নেই, কিন্তু তাঁর বাণী আছে। সেই তাঁর বাণী যেন অগ্নিকণা হয়ে প্রতি মানুষের মনের মধ্যে ফুটে ওঠে।'

এই বক্তৃতা শুনে সবাই বুঝল, স্বামীজি তাঁর যোগ্য প্রতিনিধিকেই রেখে গিয়েছেন। বুঝল যে, স্বামীজির মতে তাঁর এই শিষ্যাটির জীবনের ব্রত হলো এই জাতিকে জাগান — একে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। আর এই কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না যে, সেদিন যদি ভগিনী নিবেদিতা না থাকতেন এবং বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপন করে তিনি যদি অমর আত্মত্যাগে গুরুর আদর্শ প্রচারে না ব্রতী হতেন তা'হলে আমরা বিবেকানন্দকে ভুলে যেতাম,

প্রথম স্বদেশপ্রেমিক বিবেকানন্দকে আমাদের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে ফিরিয়ে
পেতাম না। নিবেদিতা তাই সেই বৃহৎ নীতির একটি বৃহৎ দেশপ্রেমের।

একদিন।

বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে তখন গভীর রাত।

রাত্রির সেই নিস্তব্ধ প্রহরে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার জন্য নিবেদিতা
একটি প্রবন্ধ লিখে শেষ করলেন। প্রবন্ধটির নাম: 'জাতীয় জীবনে বিবেকানন্দ'।
প্রবন্ধটি লেখা শেষ হলে টেবিলের ওপর রেখে দেবার সময় স্বামীজির ফটোখানা
তাঁর চোখে পড়ল। সেই সময়ে ঐ ফটোখানা নিজের হাতে ধরে
দেওয়ার সময় তাঁর মানসলোকে বিবেকানন্দ বলেছিলেন: 'ভারতের কল্যাণের
জন্য তোমার সেবা ও জীবন যেন সার্থক হয়, সুন্দর হয়।' গুরুর ছবিখানার দিকে
তাকিয়ে এই কথাটাই আজ বিশেষ করে মনে পড়ল।

১৯০২ সালের অক্টোবর মাসেই নিবেদিতা বিবেকানন্দ-প্রচারে
বের হলেন। সঙ্গে চললেন স্বামীজির বিশ্বস্ত শিষ্য সদানন্দ। ভারতে আসার
প্রথম দিন থেকেই স্বামীজি তাঁর এই বিদেশিনী শিষ্যটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার এঁর
ওপর দিয়েছিলেন। সদানন্দ ছিলেন নিবেদিতার ঠিক বড়ভাইয়ের মতো। প্রথমদিন
(যখন) ট্রেনে সদানন্দ বললেন, এমনি অক্লান্তভাবে ঘুরলে আপনার শরীর
খারাপ হতে পারে, একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার, তখন তার উত্তরে নিবেদিতা
বলেছিলেন, গুরুজীর জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখো। সেই শিকাগো বিশ্বধর্ম-
মহাসভায় বক্তৃতা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে তিনি কি কোনদিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন?

ক্রমে ক্রমে লাহোর, বোম্বাই, পুনা, মীরাট, সুরাট, আমেদাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে প্রায় দু'মাস ধরে নিবেদিতা ঘুরে বেড়ালেন। এর আগে প্রথম পর্যায়ে ভ্রমণ করেছিলেন উত্তরভারতের প্রধান শহরগুলি। ভ্রমণের সঙ্গে চলে অক্লান্ত বক্তৃতা। তাঁর বলবার কথা ছিল একই: বিবেকানন্দ ও বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম। নাগপুরের মরিস কলেজের ছাত্রদের এক সভায় বললেন:

'স্বামীজির মধ্যে আমরা একই সঙ্গে দেখতে পাই বিপুল আধ্যাত্মিকতা আর প্রবল দেশপ্রেম। তাঁর শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে সর্বদা প্রবাহিত হতো এক উত্তাল দেশপ্রেমের তরঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন তাঁর ইষ্ট ছিলেন, তেমনি এই ভারতবর্ষও তাঁর দ্বিতীয় ইষ্টের জায়গা জুড়ে ছিল। এমন স্বদেশহিতৈষী পৃথিবীতে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা যখন শিথিল হয়ে পড়েছে, সেই সময়েই তিনি এলেন। নবযুগকে তিনি যেমন বরণ করে নিয়েছিলেন, আবার তেমনি তিনিই ছিলেন পুরাতনের নৈষ্ঠিক পূজারী। ভারতের নিয়তি তাঁরই চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে। তাঁর সমস্ত জীবনটা অতিবাহিত হয়েছে হিন্দুধর্মের একটা সর্বজনীন ভূমিকার সন্ধানে।... বীর্যের মন্ত্র, অভীঃ মন্ত্র তিনিই শুনিয়ে গেছেন। হে বীর! সাহস অবলম্বন করো — এমন কথা ভারতের কোন সন্ন্যাসীর কণ্ঠে আমরা কখনো শুনিনি। একটি কথাই স্বামীজির বলবার ছিল, বারংবার তিনি একটি বাণীই তাঁর স্বজাতিকে অবিরতভাবে শুনিয়ে গেছেন — ওঠো, জাগো, অগ্রসর হয়ে চলো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত থামবে না। তোমরা আজ যখন স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করছ, তখন তোমরা সকলের আগে তাঁর আদর্শের কথাটাই মনে রাখবে।'

কলেজের ছাত্ররা যখন নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করল, আমরা কি করব? — তখন তিনি উত্তর দিলেন — যে যেখানে আছো যুক্ত মন নিয়ে ভারতবর্ষের সেবা কর। নাগপুরে মহারাষ্ট্র-কেশরী বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন। তিনি শুনেছিলেন যে, তাঁর গুরু পরিব্রাজক জীবনে একবার এঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতা দেখলেন তিলক বিবেকানন্দের একজন অনুরাগী।

এরপর দক্ষিণ ভারত থেকে আহ্বান এলো। নিবেদিতা মাদ্রাজ চললেন। নিবেদিতা তাঁর গুরুর মুখে এতদিন শুনেছেন দক্ষিণভারতের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার কথা। মাদ্রাজই সর্বপ্রথম বিবেকানন্দের মহত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি তাঁর শিষ্যাও লাভ করলেন মাদ্রাজবাসীদের কাছে। এখানেও তিনি গুরুর আদর্শ প্রচার করে অনেকগুলো বক্তৃতা করলেন ও বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপন করলেন।

দক্ষিণ ভারতের মন্দির, মন্দিরের স্থাপত্য, ওখানকার নীতিধারা, নরনারীর স্বভাব, আচার-ব্যবহার — সব কিছুরই মধ্যে তিনি উদ্দীপনা খুঁজে পেলেন। মন্দিরে মন্দিরে চন্দন-তিলক-চর্চিত পূজারী ব্রাহ্মণের স্তোত্রপাঠ, বাতাসে ধূপধূনা, ঘৃত-প্রদীপ আর ফুলের সুবাস, ব্রাহ্মণ-বালকের শাস্ত্রপাঠ — এই সব দেখে ও শুনে নিবেদিতা যারপর নাই তৃপ্ত ও মুগ্ধ হলেন।

॥ সাত ॥

১৯০২। অক্টোবর মাস।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে নিবেদিতা অবশেষে বরোদায় এসে পৌঁছলেন। তিনি বরোদায় এলেন বক্তৃতা করতে নয়, সোসাইটি স্থাপন করতে নয় — তিনি এলেন একটি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে। সেই মানুষ — অরবিন্দ ঘোষ। বাংলায় থাকতেই তিনি এই অদ্ভুত-চরিত্রের মানুষটির কথা নানা মুখে শুনেছিলেন। শুনেছেন — ইনি শৈশব থেকে একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর ইংলণ্ডে অতিবাহিত করেছেন প্রতিভাদীপ্ত ছাত্রজীবন। ছেলেবেলা থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ইনি অন্তর-বাহিরে, পোশাক-পরিচ্ছদে, কথায় ও চিন্তায় খাঁটি ভারতীয়ই আছেন। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তিনি একেবারেই স্বদেশী মানুষ!

(A) → এই অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ তাঁর জীবনে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা, যেমন স্মরণীয় ঘটনা ছিল লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সেই প্রথম সাক্ষাৎ। বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে মার্গারেট রূপান্তরিত হয়েছিলেন তাপসী নিবেদিতায়, আর এবার অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে নিবেদিতায় নিবেদিতা রূপান্তরিত হলেন বিপ্লবী। বাংলায় তখন যে বিপ্লব আসন্ন হয়ে উঠেছিল, যে বিপ্লবের মন্ত্র ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে অনেক আগে স্বামীজি নিজে উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন, সেই বিপ্লবের যোগ্য নেত্রী যে নিবেদিতা, প্রথম দেখার পরেই সেটা বুঝতে অরবিন্দের দেরী হয়নি।

এ কথা মিথ্যা নয় যে, যেদিন বরোদায় নিবেদিতা ও অরবিন্দ — এই দুই অগ্নিবিপ্লবী পরস্পর মিলিত হলেন, বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে সেইদিনই

এক ■■ নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। এটা যেন ইতিহাস-বিধাতারই অভিপ্রেত ছিল। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ মারা যাওয়ার পর সমস্ত দেশ, বিশেষ করে বাংলা, শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। বরোদায় অরবিন্দের কাছে যখন এই খবর পৌঁছল, তখন তিনি বুঝলেন, বাংলার শিয়রে যিনি ছিলেন জাগ্রত প্রহরীর মতো, যাঁর কাজ সবে মাত্র শুরু হয়েছিল, সেই কর্মযোগী বেদান্তকেশরীর মৃত্যুর পর বাংলাকে পথ দেখাবার আর কেউ নেই। বিবেকানন্দের তেজবীর্য, তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ, সকলের ওপর তাঁর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম অরবিন্দের তরুণ চিত্তে গভীর রেখাপাত করেছিল।

অরবিন্দ আরো বুঝলেন, জাতির সম্মুখে এই জীবন্ত আদর্শ যতদিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন বাংলার পক্ষে, ভারতের পক্ষে নিরাশ হবার কিছু নেই। কিন্তু সন্ন্যাসীর আকস্মিক মৃত্যু সেই সুদূর প্রবাসে অরবিন্দকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। বাংলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি তখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। নর-কেশরী বিবেকানন্দকে তিনি বিরাট মহান প্রাণপুরুষ বলে স্বীকার করতেন। বিবেকানন্দের প্রভাব যে তাঁর স্বদেশবাসীর জীবনে স্থায়ীভাবে কাজ করছে ও করবে, অরবিন্দ সেটা বিশ্বাস করতেন। তাইতো তিনি বলতেন, বিবেকানন্দ এখনো বেঁচে আছেন তাঁর দেশজননীর আত্মায়, দেশজননীর সন্তানদের আত্মায়।

এর থেকেই বোঝা যায় যে নিবেদিতার চিন্তাধারা ও অরবিন্দের চিন্তাধারা সেই সময় যেন একই খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। তাই বলছিলাম স্বামীজির লোকান্তর গমনের কিছুকাল পরে বরোদায় এঁদের দুজনের মধ্যে এই সাক্ষাৎকার

যেন ইতিহাস-বিধাতারই অভিপ্রেত ছিল। নিবেদিতার কথাও অরবিন্দের কানে
গিয়ে পৌঁছেছে। বরোদার বাড়িতে এই আইরিশ অগ্নিশিখাটির কার্যকলাপ তিনি
বরোদায় বসেই লক্ষ্য করছিলেন। লোকমুখে বিবেকানন্দের এই বিদুষী শিষ্যাটির
প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হলো। তাঁর বৈপ্লবিক মন নিবেদিতার
পরিচয় মেদুইন শুনেছেন তাতে অরবিন্দের মন নিবেদিতার বৈপ্লবিক মনকে
নিঃশব্দে আকর্ষণ করল। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা যেন ঠিক সেই মুহূর্তে নিবেদিতার
বৈপ্লবিক ভাবধারার সঙ্গে মিলনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

বিলেত থেকে ফিরে এসে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষের
কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ পাঠ করেই নিবেদিতা স্পষ্টই বুঝেছিলেন, বিবেকা-
নন্দের মৃত্যু হয়নি — তিনি বরোদা রাজ-কলেজের এই শান্ত শিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত
স্বল্পপরিচিত অধ্যাপকটির চিন্তার মধ্যে বেঁচে আছেন। প্রথম দর্শনেই নিবেদিতার মনে
হয়েছিল, এই মানুষটি যেন একটি প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি — ইনিই বাঙালীকে বিপ্লবের
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেবেন।

বরোদায় এসে অরবিন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময়েই নিবেদিতা
তাঁকে উপহার দিলেন স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' বই। এই বইটি পড়েই তিনি সর্বপ্রথম
যোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বরোদায় এসে অরবিন্দকে প্রথম দেখেই নিবেদিতার
মনে হলো — যেই প্রকারের তিনি দেখেছিলেন, তাঁর গুরু বিবেকানন্দকে, আর
আজ দেখলেন এই অরবিন্দকে। শান্তশিষ্ট, নির্ভীক, নিস্পৃহ এই মানুষটিও যেন
তিনি সেই রকমই ত্যাগী, তপস্বী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ঠিক সেই রকমই দেশপ্রেমিক।
নিবেদিতার চোখে অরবিন্দকে যেই বিবেকানন্দেরই প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়েছিল। মনে

হয়েছিল বরোদার শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বসেই ইনি নিঃশব্দে দেশমাতৃকার বোধনের আয়োজন করছেন। আরো মনে হয়েছিল, কেমন করে দেশকে, জাতিকে ভালোবাসা যায় সেই বোধ হয় এই মৌন শান্ত মানুষটির জীবনদর্শন। পরোক্ষে এসে নিবেদিতা তাঁর অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন অরবিন্দের অন্তর-নিহিত স্বদেশপ্রেমের আগুনের উত্তাপ।

space

প্রথম সাক্ষাতেই নিবেদিতা অরবিন্দকে প্রশ্ন করলেন : আপনি কি শক্তির-উপাসক?

— হ্যাঁ। আপনার দার্শনিক মতবাদ কি?

— [illegible]

— অদ্বৈত-বেদান্ত। আপনার?

— আমি লীলায় বিশ্বাস করি। আমার কাছে এই জগৎ সত্য।

— কিন্তু এসব আলোচনা এখন থাক। কলকাতায় যাবেন না? বাংলাই আপনার উপযুক্ত স্থান।

— না। আমি পেছনে থাকব। আমার কাজ মানুষ তৈরি করা।

— বাংলায় বিপ্লবের সূচনা দেখে এসেছি। এখন দরকার তেমন নেতার। আপনাকে বিপ্লবের নায়ক হতে হবে।

— আমি যা চাই, আপনিও কি তাই চান?

— হ্যাঁ। ঈশ্বরবিশ্বাস আমার ছদ্মবেশ। ভবানীর নামে শপথ করছি আমি আপনার পাশেই দাঁড়াব।

— আমি কি সত্যিই আপনার উপর নির্ভর করতে পারি?

— নিশ্চয়ই। আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবের কোলে আমার জন্ম। রাশিয়ার বিপ্লবী পিওতর [illegible] প্রিন্স ক্রোপটকিনের কাছে আমি বিপ্লবের পাঠ গ্রহণ করেছি লণ্ডনে থাকবার সময়ে।

— বেশ, লক্ষ্য যখন আমাদের এক, তখন আজ থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু হলাম।

নিবেদিতার সঙ্গে আলাপ করে অরবিন্দ বুঝলেন, রামকৃষ্ণ যেমন বিবেকানন্দকে রেখে গিয়েছিলেন, বিবেকানন্দও তেমনি রেখে গিয়েছেন নিবেদিতাকে তাঁর সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে। তখন অরবিন্দ বললেন, কিছুকাল আগে তিনি কলকাতায় গিয়ে গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বের উদ্বোধন করে এসেছেন। বরোদা থেকে ফিরে এসে নিবেদিতা ঐ সমিতিতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন। এর ঠিক তিন বছর পরেই বাংলায় যখন বিপ্লবের বিষাণ বেজে উঠল তখন সবাই সবিস্ময়ে দেখতে পেল যে, নিবেদিতা ও অরবিন্দ দুজনেই একযোগে সেই বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিলেন। একজন হলেন বিপ্লবের শিক্ষাগুরু, অন্যজন হলেন দীক্ষাগুরু।

#Space#

১৯০৩। এপ্রিল মাস।

নতুন বাড়িতে স্কুল উঠে গেল। নিবেদিতার স্কুলটি এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগের চেয়ে ছাত্রী সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুলের ছাত্রীদের যাওয়া-আসার জন্য জগদীশচন্দ্র নিজে একখানা ঘোড়ার গাড়ি কিনে দিয়েছেন। স্বামীজির গ্রন্থ

আর্কিন শিষ্যা, মিসেস ওলিবুল নিজে থেকে কিছু অর্থসাহায্য ; রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষও অনেক টাকা দিয়েছেন। এঁরই বাড়িতে স্বামীজি ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিধবাদের জন্য দুটি শিল্প-ক্লাস খোলা হয়েছে ; সেলাইয়ের ক্লাসও আরম্ভ হয়েছে। কলকাতার গোঁড়া হিন্দু সমাজ ক্রমে তাঁর এই প্রতিষ্ঠানের খুব সহযোগিতা করেছেন। নতুন স্কুল-বাড়িতে ঢোকার পথে বাইরের দেয়ালে আঁটা কাঠের সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে: 'ভগিনী-নিবাস। নারীসমিতি - পাঠশালা-গ্রন্থাগার।' সব দেখেই সকলে বুঝতে পারত যে, এই বাড়িতে মেয়েদের জন্য স্কুল আছে, সমিতি আছে ও একটা লাইব্রেরিও আছে।

মাঝে মাঝে স্কুলের উৎসব হতো। নিবেদিতা পাড়ার সকলকে ডেকে নিমন্ত্রণ করতেন। বিকেল বেলা বাড়ির বৌ-ঝিরা সব গাড়িতে আসতো, উঠোনের পাশে সবুজ রঙের চিকের আড়ালে তাঁরা বসতেন। সকলেই পর্দানশীন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বসত উঠোনের মাঝখানে। মাদুরে মোড়া আর ফুলপাতা দিয়ে সাজানো ছোট্ট উঠোন সাজত। তার ওপর জ্বলত উজ্জ্বল পেট্রোল ল্যাম্পের আলো। পাড়ার সব ধনী মহিলা এই স্কুলের জন্য দান করেছেন। সেই উৎসবে আর সকলে কথাবার্তার আয়োজন করেন। তারপর স্বামী পুরাণের গল্প বলেন সুমধুর স্বরে, অভিনয়ের ভঙ্গিতে। সকলেই তন্ময় হয়ে আছে।

এইভাবেই নিবেদিতা কলকাতার পল্লীটিকে আপন করে তুলেছিলেন। এখন আর কেউ তাঁকে মেম সাহেব মনে করে দূরে সরে থাকেন না, এখন নিবেদিতার ভগিনী নিবাসে আসতে কারো সংকোচ বোধ হয় না। এখন সকলেই

বিশ্বাস করে ছেলেমেয়ে পাঠায় এখানে। এইভাবেই তিনি গুরুর আশীর্বাদে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের হৃদয় জয় করেছিলেন। সকল বর্ণের ছাত্রীরা একসঙ্গে পড়তে আসত। মহাপুরুষদের ধ্যান করাতে করাতে সেলাইয়ের শিক্ষা দেওয়া হতো। মুখে গান, হাতে সূঁচ-সুতো। দেয়ালের গায়ে টাঙানো ভারতবর্ষের একটি প্রকাণ্ড মানচিত্র। সেই মানচিত্র বা ম্যাপ দেখে ছাত্রীদের কল্পনা পাখা মেলে। এই স্কুলবাড়ির আঙিনা থেকে শহর, তারপর বাংলাদেশ, তারো পরে ভারতবর্ষ আর মাথায় হিমালয়ের মুকুট আর পায়ের তলায় সাগরের নীল জল। এদের সঙ্গে ছিল যে সম্পর্ক তা নিবেদিতা ছাত্রীদের বুঝিয়ে দিলেন।

মাঝে মাঝে স্কুলের অর্থাভাব প্রকট হয়। উন্নতির জন্য আরো টাকার দরকার।

তবু অন্যের দান তিনি নিতেন না — নিজের দায় নিজেই বহন করতেন। নিজে যার বক্তৃতা দিয়ে যা রোজগার করতেন সেই টাকা দিয়ে নিবেদিতা স্কুল চালাতেন। স্কুলের জন্যই তাঁর পরিশ্রমের শেষ ছিল না — সারাটা দিনই তাঁর নিজের ঘরটিতে বসে লেখাপড়ার কাজ নিয়ে থাকতেন। মাঝে মাঝে বাক্স থেকে গুরুর পুরানো চিঠিগুলি বের করে পড়তেন। ১৯০০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের একটি চিঠিতে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে স্কুল সম্বন্ধে লিখেছিলেন: 'টাকার জন্য কিছু ভেবো না। তোমার স্কুলের জন্য টাকা আপনি জুটে যাবে — নিশ্চয়।' চিঠিগুলো যখনই পড়তেন তখনই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তিনি জোর খুঁজে পেতেন। সাহস পেতেন। এমন দিনও গিয়েছে যখন তাঁদের সামান্য খাওয়া জুটেছে — হয়তো দু'টুকরো পাঁউরুটি

আর দুটো কথা। তবেই খুশী সাঁটিয়ে নিবেদিতা হাসিমুখে স্কুল চালিয়েছেন।

একেই বলে তপস্যা।

রবীন্দ্রনাথ একবার প্রস্তাব করলেন, একটা নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নিকট নৈবেদ্য সাড়ে একটা অংশ নিবেদিতাকে দিতে তিনি রাজী আছেন। তিনি সে লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন এই বলে। "আমি এখানে বসেই তপস্যা করব, অন্য কোথাও যাব না। গুরু আমাকে এই ব্রত দিয়ে গেছেন।" নিবেদিতার মনের এই দৃঢ়তার কথা স্মরণ করেই কবি লিখেছিলেন: "তিনি বাগবাজারের একটি ক্ষুদ্র গলির নিভৃতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।"

আত্মসমর্পণই বটে! যেদিন আমরা এর মূল্য বুঝতে পারব, সেদিন হয়ত আমরা এই মহীয়সী নারীর যথার্থ ধারণা করতে পারব। সেদিন তাঁর স্কুলটি সামান্য ছিল, কিন্তু একদিন এটাই যে অসামান্য হয়ে উঠতে পারে, এই বিশ্বাস নিয়েই তো নিবেদিতা বাগবাজারের সেই ছোট্ট গলিটির কাছে আত্মসমর্পণ করে, যেখানে বীর্য ও শ্রদ্ধা একটি নারীকে গড়ে বিবেকানন্দের কল্পনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। তাঁর সেই জীবনব্যাপী করা চেষ্টা তপস্যারই মতো ছিল। তপস্যা আন্তরিক ছিল, কখনো তাতে বিঘ্ন হয়নি। এমনি করেই ভগিনী নিবেদিতা বাংলা তথা ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের আসন লাভ করেছিলেন, পাশ্চাত্যের আর কোন নারীর জীবনে তেমন সৌভাগ্য লাভ হয়নি।